উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
পৌরাণিক কাহিনী

পৌরাণিক কাহিনী

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম (নাথ পাবলিশিং) সংস্করণ
জানুয়ারী ১৯৭৮
পৌষ ১৩৮৪

চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
মাঘ ১৩৯৩

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
কৃষ্ণ বোস
অঙ্কুর
৪৪ বি সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

সাত টাকা

সূচীপত্র

বিষ্ণুর অবতার

পুরাণে আছে যে বিষ্ণু সময়-সময় নানারূপ জন্তু ও মানুষের রূপ ধরিয়া অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর এই সকল রূপ ধারণকে তাঁহার এক একটি 'অবতার' বলা হয়।

এই যে সৃষ্টি, তাহার জীবন নাকি এক কল্প কাল। এক এক কল্প পরে 'প্রলয়' অর্থাৎ সৃষ্টি নাশ হইয়া আবার নাকি নূতন সৃষ্টি হয়। এখনকার এই জগতের সৃষ্টি হইবার পূর্বে আর এক জগতের প্রলয় হইয়াছিল। বিষ্ণু তাহার পূর্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রলয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি একটি খুব ছোট মাছের রূপ ধরিয়া কৃতমালা নামক নদীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনু সেই নদীর নিকট থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন মনু কৃতমালার জলে নামিয়া তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখিলেন যে, একটি নিতান্ত ছোট মাছ তর্পণের জলের সঙ্গে তাঁহার অঞ্জলির ভিতর উঠিয়াছে।

সেই মাছটিই ছিলেন বিষ্ণু, কিন্তু মনু তাহা জানিতেন না। তিনি মাছটিকে জলে ফেলিয়া দিতে যাইবেন এমন সময় সে তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিল, 'আমাকে জলে ফেলিবেন না। বড় মাছেরা খাইয়া ফেলিবে।' এ কথায় মনু তাহাকে তাঁহার ঘরে আনিয়া কলসীর ভিতরে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু সে মাছ এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল যে, দেখিতে দেখিতে আর সে সেই কলসীতে ধরে না। কলসী হইতে চৌবাচ্চায় রাখিলেন, খানিক পরেই আর সে তাহাতেও ধরে না; চৌবাচ্চা হইতে পুকুরে রাখিলেন, শেষে তাহাতেও ধরে না, সেখান হইতে হ্রদে রাখিলেন, ক্রমে তাহাও তাহার পক্ষে ছোট হইয়া গেল।

তখন মনু তাহাকে কাঁধে করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিবামাত্র সে লক্ষ যোজন বড় হইয়া যাওয়ায় তিনি যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবান, আপনি কে? আপনি নিশ্চয় স্বয়ং বিষ্ণু! আপনাকে নমস্কার।' মাছ বলিল, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের নিমিত্ত মৎস্যরূপ-ধারণ করিয়াছি। আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে সকল সৃষ্টি সাগরের জলে ডুবিয়া যাইবে। সেই সময়ে তোমার নিকট একখানি নৌকা আসিবে, তুমি সপ্তর্ষিদিগকে আর সকল জীবের দুটি দুটিকে সঙ্গে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিও। তখন আমিও আবার আসিব, আমার শিঙে তোমার নৌকাখানিকে বাঁধিয়া দিও।' এই বলিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন, তারপর ক্রমে তাঁহার কথা মত সমস্তই ঘটিতে লাগিল। সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, নৌকা আসিল, সেই মাছও আসিয়া দেখা দিল—সে এখন দশ লক্ষ যোজন বড়, দেহ সোনার, তার মাথায় একটা শিঙ। সেই শিঙে নৌকা বাঁধিয়া দিলে আর কোন বিপদের আশঙ্কা রহিল না।

ইহাই হইল বিষ্ণুর মৎস্যাবতার, তারপর কূর্মাবতার। সমুদ্রের ভিতর অমৃত ছিল, সেই অমৃত পাইবার জন্য দেবতারা দৈত্যগণের সহিত মিলিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিয়াছিলেন। সেই মন্থনের দণ্ড হইয়াছিল মন্দার পর্বত, আর দড়ি হইয়াছিল বাসুকি নাগ। মন্থন আরম্ভ হওয়া মাত্রই সেই পর্বত জলের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে লাগিল, কাজেই দেবতারা দেখিলেন তাঁহাদের সকল পরিশ্রমই মাটি হইতে চলিয়াছে। সেই সময় বিষ্ণু বিশাল কচ্ছপের রূপ ধরিয়া পর্বতটাকে পিঠে করিয়া লইয়াছিলেন, নচেৎ নিশ্চয় তাহা একেবারেই তলাইয়া যাইত, মন্থন অসম্ভব হইত, দেবতাদের ভাগ্যেও আর অমৃত খাওয়া ঘটিত না।

কূর্মাবতারের পর বরাহবতার। হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু নামে দুইজন ভয়ানক দৈত্য ছিল। দেবতাদিগকে তাহারা যেরূপ নাকাল করিয়াছিল, সে আর বলিবার নহে। হিরণ্যাক্ষ ছেলেবেলায় হাতি আর সিংহতে চড়িয়া সূর্যটাকে লইয়া খেলা করিত। তারপর একদিন সে করিল কি, কুকুর যেমন মুখে করিয়া পিঠে লইয়া ছুট দেয়, তেমনিভাবে সে পৃথিবীটাকে মুখে লইয়া জলের ভিতর গিয়া ঢুকিল। ইহাতে ব্রহ্মা নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার এমন শক্তি হইল না যে, দুষ্ট দৈত্যের মুখ হইতে পৃথিবীটাকে ছিনাইয়া আনেন। তখন তিনি আর উপায় না দেখিয়া বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু একটি শূয়রের বেশ ধরিয়া তাঁহার নাকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর সেই শূয়র বাড়িতে বাড়িতে পর্বত প্রমাণ হইয়া জলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সেই জলের নিকটে নারদ মুনি ছিলেন, তিনি শূয়রকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া জোড় হাতে বলিলেন, 'আজ্ঞা করুন, কী করিব।' শূয়র বলিল, 'আমি যতক্ষণ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তুমি কেবলই জল শুষিতে থাকিবে।' নারদ দু হাতে জল তুলিয়া ক্রমাগত মুখে দিতে লাগিলেন ; যতক্ষণ না হিরণ্যাক্ষের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি থামেন নাই। সেই যুদ্ধ জলে পাঁচশত বৎসর, আর স্থলে পাঁচশত বৎসর, সবসুদ্ধ এক হাজার বৎসর চলিয়াছিল। তারপর সেই শূয়র হিরণ্যাক্ষকে মারিয়া মুখে করিয়া পৃথিবীকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া ব্রহ্মাকে দিল।

ইহার পর নৃসিংহাবতার। বিষ্ণু এবারে অর্ধেক মানুষের আর অর্ধেক সিংহের মত অতি ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে ভয়ানক রাগিয়া গিয়া হিরণ্যকশিপু তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য দশ হাজার বৎসর ঘোরতর তপস্যা করে। তাহার দেহে গাছ হইল, তাহাতে পাখিরা বাসা করিল, তথাপি সে তপস্যা ছাড়িল না। তখন ব্রহ্মা আর থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বর দিতে আসিলে সে বলিল, 'আপনার সৃষ্ট কোন বস্তু বা জীব আমাকে বধ করিতে পারিবে না, এই বর আমাকে দিন।' ব্রহ্মা সেই বর তাহাকে দিয়া চলিয়া গেলেন,—আর অমনি দৈত্য তাহার জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, কাহাকেও সে নিশ্চিন্ত

হইয়া থাকিতে দিল না, সকলেরই ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লইল। তখন দেবতাগণ তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া বিষ্ণুর নিকট নিজ নিজ দুঃখ জানাইলে বিষ্ণু বলিলেন, 'তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি শীঘ্রই এই দৈত্যকে বধ করিয়া তোমাদের দুঃখ দূর করিব।'

কিন্তু বিষ্ণুর উপরেই হিরণ্যকশিপুর সর্বাপেক্ষা অধিক রাগ ছিল। সে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। তাহার নিজের পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ছিল, সেজন্য দুষ্ট দৈত্য সেই বালককে কী ভীষণ যন্ত্রণাই দিয়াছিল! কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই হরিনাম পরিত্যাগ করে নাই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর হরি কোথায় আছে?' প্রহ্লাদ বলিল, 'তিনি সর্বত্রই আছেন।' হিরণ্যকশিপু একটা থাম দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এই থামের ভিতর আছে?' প্রহ্লাদ বলিল, 'অবশ্য আছেন।' হিরণ্যকশিপু তখন খড়্গ লইয়া মহারোষে সেই স্তম্ভে আঘাত করিল। অমনি বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ গর্জনে বিষ্ণু সেই স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার দেহ অর্ধেক মানুষের অর্ধেক সিংহের ন্যায়; নখ অতি ভীষণ; কেশর উড়িয়া মেঘে ঠেকিয়াছে, মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে। দৈত্যেরা ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর নৃসিংহমূর্তি নিজের নিশ্বাস দ্বারাই আর সকল দৈত্যকে মুহূর্তে ভস্ম করিয়া, দেখিতে দেখিতে হিরণ্যকশিপুর বুক নখে চিরিয়া তাহার রক্ত খাইতে আরম্ভ করিলেন।

এত করিয়াও সেই ভীষণ মূর্তির রাগ দূর হইল না, তাঁহার মুখের আগুনও নিবিল না। তখন দেবতাগণ যারপরনাই ভয় পাইয়া তাঁহাকে থামাইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কাহারও তাঁহার নিকটে যাইতে ভরসা হইল না। ইন্দ্র বলিলেন, 'আমার চোখ ঝলসিয়া যাইবে!' ব্রহ্মা বলিলেন, 'আমার দাড়ি পুড়িয়া যাইবে!'

গণেশ অনেক সাহস করিয়া তাঁহার ইঁদুরে চড়িয়া কিছু দূর আসিয়াছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ নৃসিংহের ফুঁ লাগিয়া তাঁহার ইঁদুরটি উলটিয়া যাওয়াতে তাহাতে তাঁহার সেই বিশাল ভুঁড়িসুদ্ধ গড়াগড়ি যাইতে হইল।

শেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে মহাদেব অতি অদ্ভুত শরভের মূর্তি ধরিয়া নৃসিংহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই শরভকে দেখিবামাত্র নৃসিংহের রাগ থামিয়া গেল, সকলের ভয়ও দূর হইল।

দেবতাদিগের সহিত অসুরেরা চিরকালই ঘোরতর শত্রুতা করিত, আর অনেক সময়ই তাঁহাদের লাঞ্ছনা করিত। প্রহ্লাদের পিতা কী করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। প্রহ্লাদের নাতি বলিও তাহার চেয়ে নিতান্ত কম করে নাই। এদিকে বলি ধার্মিক ছিল খুবই, কিন্তু তাহা হইলে কী হয়? সে যে অসুর, কাজেই দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

একবার সে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দলবলসুদ্ধ স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন দেবতাগণ আর কী করিবেন? তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুর

আশ্রয় লইলেন। এদিকে ইন্দ্রের মাতা অদিতি দেবীও একমনে বিষ্ণুকে ডাকিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, 'হে দেব! আমাকে এমন একটি পুত্র দান কর, যে এইসকল অসুরকে বধ করিতে পারে।' কিছুকাল এইরূপে প্রার্থনা করার পর বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'মা তুমি দুঃখ করিও না, আমি নিজেই তোমার পুত্র হইয়া অসুর বধ করিব।'

সেই পুত্রের নাম বামন। এমন সুন্দর ছোট্ট খোকা আর কেহ কখনও দেখে নাই। ঐরূপ ছোট্ট ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বামন। দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস যে তাঁহাকে দিলেন—কেহ দিলেন পৈতা, কেহ দিলেন লাঠি, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কাপড়, কেহ বেদ, কেহ জপের মালা।

বড় হইয়াও সেই খোকা তেমনি ছোট্টটিই রহিয়া গেলেন। তারপর একবার বলি এক বিশাল যজ্ঞ আরম্ভ করিল, মুনি ঋষি কত যে তাহাতে আসিলেন তাহার সংখ্যা নাই। বামনও সেই যজ্ঞের কথা শুনিয়া বেদের মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলি দেখিল, কোথা হইতে একটি ছোট্ট মুনি আসিয়াছেন, তাঁহার মাথায় জটা, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু আর ছাতা। সে অতিশয় আদরের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ঠাকুর, আপনার কী চাই?' বামন বলিলেন, 'আমি তোমার নিকট তিন পা জমি চাই।'

এ কথায় বলি হাসিয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুর! মোটে তিন পা জমি দিয়া কী করিবে? ও তো ছেলেমানুষের কথা! বড় বড় গ্রাম চাও, টাকাকড়ি লোকজন যত খুশি চাও।'

বামন বলিলেন, 'আমার অত জিনিসের দরকার নাই। আমার তিন পা জমি হইলেই চলিবে। বেশি লোভ করা ভাল নয়।'

তখন বলি বলিল, 'আচ্ছা, তবে তুমি তিন পা জমিই নাও।' তারপর হাতে জল লইয়া সে বামনকে তিন পা জমি দান করিতে যাইবে, এমন সময় তাহার গুরু শুক্রাচার্য ব্যস্তভাবে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, কর কী? ওকে যে-সে লোক ভাবিও না! ইনি আর কেহ নহেন, বিষ্ণুই নিজে বামন সাজিয়া আসিয়াছেন! ইঁহাকে কিছুই দিও না, দিলে তোমার সর্বনাশ হইবে!'

বলি বলিল, 'সামান্য একজন ভিক্ষুককেও আমি অমনি ফিরাই না, ইঁহাকে কেন ফিরাইব? বিশেষত আমি দিব বলিয়াছি।'

এই বলিয়া বলি তিন পাদ ভূমি দান করিবামাত্র দেখিল, সেই খোকা আর খোকা নাই। সে এখন আকাশের চেয়েও উঁচু বিরাট পুরুষ হইয়া গিয়াছে। তারপর দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট পুরুষের নাভি দিয়া আর একটি পা বাহির হইল। তখন তিনি এক পদে পৃথিবী, এক পদে স্বর্গ আর তৃতীয় পদে স্বর্গেরও উপরে মহলোক জনলোক প্রভৃতি ঢাকিয়া ফেলিয়া বলির যত রাজ্য সকলই কাড়িয়া লইলেন। ইহার পর দুষ্ট অসুরগুলিকে বধ করিয়া পুনরায় ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের রাজ্য দিয়া দিলেন।

যাহা হউক, বলি ধার্মিক লোক ছিল, সুতরাং শ্রীবিষ্ণু তাহাকে বধ না করিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন, 'তুমি এক কল্পকাল বাঁচিয়া থাক। এই ইন্দ্রের পরে তুমি ইন্দ্র হইবে। এখন তুমি সুতল নামক পাতালে গিয়া বাস কর। সে অতি সুন্দর স্থান। দেখিও আর কখনও যেন দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ করিও না।' তদবধি বলি পাতালেই বাস করিতেছে।

ইহাই বিষ্ণুর বামন অবতার। ইহার পরের অবতার পরশুরাম। সে অবতারে বিষ্ণু জমদগ্নি মুনির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

সেকালে ক্ষত্রিয়েরা বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে সাজা দিবার জন্যই পরশুরামের জন্ম।

তখনকার প্রধান ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন কার্তবীর্যার্জুন, অর্থাৎ কৃতবীর্যের পুত্র, অর্জুন। ঋষি দত্তাত্রেয়ের বরে অর্জুনের এক হাজার হাত হইয়াছিল। সেই এক হাজার হাতে অস্ত্র লইয়া তিনি দেবতাদিগকেও যুদ্ধে হারাইয়া দিতেন। এজন্য তাঁহার দর্পের আর সীমা ছিল না।

একবার কার্তবীর্য মৃগয়া করিতে গিয়া বনের ভিতরে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্বক নিজের আশ্রমে আনিয়া বিবিধ উপচারে আহার করাইয়াছিলেন। ভাল লোক হইলে ইহাতে সে মুনির প্রতি কতই কৃতজ্ঞ হইত। আর হয়ত তাঁহার কত উপকার করিত। কিন্তু কার্তবীর্য সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। মুনি যে তাঁহাকে কত ক্লেশ হইতে বাঁচাইলেন, সে কথা তাঁহার মনেই আসে নাই। তিনি একদৃষ্টে কেবল মুনির গাইটিকেই দেখিতে লাগিলেন। সেটি কামধেনু, মুনি তাহার নিকট যাহা চাহেন তাহাই পান, হাজার লোক তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারে না। রাজা ভাবিলেন, এ গাইটি তাঁহার না হই-লেই চলিতেছে না। কাজেই তিনি মুনিকে বলিলেন, 'ভগবান, গাইটি আমাকে দিন।' সে কথায় রাজী না হওয়ায় রাজা সেটি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

পরশুরাম কার্তবীর্যকে বধ করিয়া সেই গাই ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর তিনি বনে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় কার্তবীর্যের পুত্রেরা আসিয়া অতি নিষ্ঠুর-ভাবে মহর্ষি জমদগ্নির প্রাণ নাশ করিল।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া সেই দারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পৃথিবীর যত ক্ষত্রিয় সব তিনি মারিয়া শেষ করিবেন। তারপর ভীষণ কুঠার হস্তে সেই যে তিনি ক্ষত্রিয় মারিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদিগকে শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত হইলেন না। একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমাগত একুশবার তিনি এইরূপে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়ের রক্তে কুরুক্ষেত্রে পাঁচটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পিতার তর্পণ করিলে তবে তাঁহার ক্রোধ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

ক্ষত্রিয়েরাই ছিল পৃথিবীর রাজা। তাহাদিগকে বধ করায় তাহাদের সকল রাজ্যই পরশুরামের হইল। সেইসব রাজ্য তখন তিনি মহর্ষি কশ্যপকে দান করি-লেন। দান করিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে, সকলই তো পরের রাজ্য হইল।

এখন কোথায় বাস করি ? এই ভাবিয়া তিনি সমুদ্রের জল সরাইয়া এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিলেন ; তদবধি উহাই তাঁহার বাসস্থান হইল।

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম—বিষ্ণুর এই ছয়টি অবতারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পর রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি—এই চারি অবতারের কথা বলিতে বাকি আছে। শেষ অবতার কল্কি এখনো জন্মগ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার কথা এখন না বলিলেও বিশেষ ক্ষতি দেখা যায় না। পুরাণে লেখা আছে যে, তিনি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণুর যে ঠিক কয়টি অবতার হইয়াছিল, সে কথাও যে আমি একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা নহে। দশটি অবতারের কথা আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, কিন্তু কোন-কোন পুরাণে দেখা যায় যে তাঁহার অনেক হাজার অবতার হইয়াছে, আরো অনেক হইবে। বুদ্ধ যে বিষ্ণুর অবতার এ কথা সকলে বলেন না, অনেকের মতে আবার চৈতন্যও বিষ্ণুর অবতার।

যাহা হউক, রাম আর কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর অবতার, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। ইহার মধ্যে রামের কথা হয়ত তোমরা সকলেই রামায়ণে পড়িয়াছ, সুতরাং তাঁহার কথাও বেশি করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণের নামও তোমরা সকলেই শুনিয়াছ বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা অনেকের জানা না থাকিতে পারে। বিশেষত কৃষ্ণের বাল্যকালের বিবরণ অতি আশ্চর্য, তাহা শুনিলে তোমরা খুবই আমোদ পাইবে।

কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র, তাঁহার মাতার নাম দেবকী। সে সময় মথুরা নগরে কংস নামে এক অতি দুষ্ট রাজা ছিল। বসুদেবের বিবাহের সময় কংসের নিকট এইরূপ দৈববাণী হয় যে, 'দেবকীর অষ্টম পুত্র তোমাকে বধ করিবে !' এ কথা শুনিয়া কংস দেবকীকে কাটিতে গেলে বসুদেব তাহাকে বিনয় করিয়া বলিলেন, 'আপনি দেবকীকে বধ করিবেন না, ইহার সন্তানদের আমি আপনার হাতে সমর্পণ করিব।' এ-কথায় কংস দেবকীকে বধ করিল না বটে, কিন্তু বসুদেবকে সুদ্ধ তাঁহাকে গোপন একটা ঘরের মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিল।

তারপর একটি একটি করিয়া দেবকীর পুত্র হয়, আর বসুদেব নিজের কথামত অমনি তাহাকে কংসের নিকট দিয়া আসেন। ক্রমে ছয়টি সন্তান এইভাবে মারা গেল। সপ্তম সন্তানটি জন্মিবার পূর্বেই বিষ্ণুর কথায় যোগনিদ্রা (দুর্গা) দেবী তাহাকে দেবকীর নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। বসুদেবের রোহিণী নামে আর-এক স্ত্রী ছিলেন। যোগনিদ্রার কৌশলে দেবকীর সেই সপ্তম সন্তানটি রোহিনীর সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিল, লোকে বুঝিল যে দেবকীর এই সন্তান জন্মিবার পূর্বেই মারা গিয়াছে। এই সন্তানটি বলরাম।

দেবকীর অষ্টম সন্তানটিই কৃষ্ণ। সেটি যখন জন্মগ্রহণ করে, ঠিক সেই সময় গোকুলে গোপগণের রাজা নন্দেরও একটি কন্যা হয়। বসুদেব তাঁহার শেষ সন্তানটিকে আর কংসের হাতে দেন নাই, সেটি জন্মিবামাত্র তিনি তাহাকে লইয়া গোকুলে চলিয়া

গেলেন। দেবী যোগনিদ্রা তখন মথুরার দ্বারপালদিগকে এমনি মায়ায় ভুলাইয়া রাখিলেন যে, বসুদেব যাইবার সময় তাহারা কিছুই টের পাইল না।

সেদিন রাত্রি বড়ই ভয়ঙ্কর ছিল। আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা ভীষণ গর্জনে চারিদিক ভাসাইয়া দিতেছে, ঝড়ের হাওয়ায় যমুনার গভীর জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই অতল জলে বসুদেবের হাঁটু অবধিও ডুবিল না। তিনি অনায়াসে হাঁটিয়া যমুনা পার হইলেন। এদিকে অনন্ত নাগ তাঁহার বিশাল ফণা বিস্তার করিয়া বসুদেবকে ঢাকিয়া রাখায় বৃষ্টির জলও বিন্দুমাত্র তাঁহার গায়ে পড়িতে পারিল না।

গোকুলে সেদিন গোপেরা উপস্থিত ছিল না, তাহারা কংসকে কর দিতে গিয়াছিল। ইহার মধ্যে নন্দের স্ত্রী যশোদার একটি কন্যা জন্মিল, কিন্তু তখন তিনি যোগনিদ্রার মায়ায় ঘুমে অচেতন থাকায় কিছুই টের পাইলেন না। এই অবসরে বসুদেব আসিয়া কৃষ্ণকে যশোদার পাশে রাখিয়া যশোদার কন্যাটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তারপর যশোদা জাগিয়া যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পাশে নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ পরম সুন্দর একটি খোকা শুইয়া আছে, তখন তিনি তাহাকে তাঁহার নিজের পুত্র মনে করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন।

এদিকে বসুদেব সেই কন্যাটিকে আনিয়া দেবকীর নিকট দেওয়ামাত্র তাহার শব্দে কংসের প্রহরীদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহারা তখন কংসকে সংবাদ দিল, আর কংসও তাহা শুনিয়া দেবকীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে তিলমাত্র বিলম্ব করিল না। দেবকী সেই কন্যাটিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য কংসের নিকট মিনতি করিলেন, কিন্তু দুরাত্মা তাঁহার কোন কথায় কান না দিয়া বিষম রোষভরে শিশুটিকে পাথরে আছড়াইয়া ফেলিল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সে মেয়েটি পাথরে না পড়িয়া শূন্যেই রহিয়া গেল। সে তো আর যে-সে মেয়ে ছিল না, তিনি ছিলেন স্বয়ং যোগনিদ্রা। তিনি তখন নিজের অপরূপ মূর্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কংসকে বলিলেন, 'মূর্খ! আমাকে আছড়াইলে কী হইবে? তোমাকে যিনি মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন, এখন বাঁচিবার পথ দেখ।' এই বলিয়া দেবী আকাশে মিলাইয়া গেলেন, কংস হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে তখন ভাবিল যে, আমি বৃথাই দেবকীর এতগুলি সন্তানকে নষ্ট করিলাম। এখন দেখিতেছি, আমাকে মারিবার জন্য আর কোথাও যেন একটা বালক জন্মিয়াছে! এই ভাবিয়া সে বসুদেব আর দেবকীকে কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিল, আর নিজের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিল যে, 'তোমরা বিশেষ করিয়া দেখ, কোথায় কাহার ছেলে হইয়াছে। এই সকল ছেলের মধ্যে যাহাকে ষণ্ডা দেখিবে, তাহাকেই বধ করিতে হইবে।'

সেই ষণ্ডা খোকাটি যে কে, তাহাও জানিতে কংসের অধিক বিলম্ব হইল না। তখন হইতেই তাহাকে বধ করিবার জন্য দুষ্ট বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

শিবের বিয়ে

দুর্গার এক নাম 'পার্বতী', অর্থাৎ, পর্বতের মেয়ে। তাঁর পিতা হিমালয়, মা মেনকা। শিবের সঙ্গে যাতে তাঁর বিয়ে হয় এজন্য পার্বতী অনেক দিন ধরে কঠিন তপস্যা করেছিলেন, তার ফলে শেষে শিবের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হল।

পার্বতীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু বর যে, সে তো আর নিজে কনের বাপের কাছে গিয়ে বিয়ে ঠিক করতে পারে না, তাহলে লোকে হাসে। কাজেই শিব সপ্তর্ষিদের ডেকে পাঠালেন। সপ্তর্ষিরাও তখনই সোনার বল্কল পরে, মুক্তামালা গলায় দিয়ে, মণি-মানিকের গহনা ঝলমলিয়ে তাঁর কাছে এসে জোড় হাতে বললেন, 'আমাদের কী সৌভাগ্য ! প্রভু আজ আমাদের স্মরণ করেছেন। আজ্ঞা করুন, আমাদের এখন কী করতে হবে।'

শিব বললেন, 'আমি হিমালয় পর্বতের মেয়ে পার্বতীকে বিয়ে করতে চাই, তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে সব ঠিকঠাক কর। দেখ যেন ভালমতো কাজটি করে আসতে পার।'

সপ্তর্ষিরা তখন নিমেষের মধ্যে আকাশে উড়ে, সেই ঝকঝকে হিমালয় পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হিমালয় দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে মেনকাকে বললেন, 'না জানি ঐ সাতটি সূর্য কী করতে আমাদের এখানে আসছে !' বলতে বলতেই তিনি দেখলেন, ওসব সূর্য নয়, সাতটি মুনি। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে গিয়ে, জোড়হাতে তাঁদের নমস্কার করে বসতে সুন্দর আসন দিয়ে বললেন, 'মুনি-ঠাকুরেরা কী মনে করে আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন ?' মুনিরা বললেন, 'শিব তোমার কন্যা পার্বতীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন, তাই আমরা এসেছি। এমন জামাই আর পাবে না রাজা, শিবের কাছে তোমার পার্বতীর বিয়ে দাও।'

তা শুনে হিমালয়ের আর আনন্দের সীমাই রইল না। তিনি তখনই ছুটে গিয়ে, পার্বতীকে সাজিয়ে গুজিয়ে এনে মুনিদের কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন আমার পার্বতীকে। এমন সুন্দরী লক্ষ্মী মেয়ে আর কখনও হয়নি, হবেও না।' পার্বতীকে দেখে স্নেহে মুনিদের মন গলে গেল। তাঁরা তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে, তাঁকে কত আশীর্বাদ করে, বিয়ের সব কথাবার্তা বলে সেখান থেকে পরম আনন্দে হাসতে হাসতে চলে এলেন। স্থির হল যে, আর তিন দিন পরেই শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে।

সপ্তর্ষিরা শিবের কাছে এসে এসব কথা জানালে শিব যারপরনাই খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ বেশ ! বিয়ের সময় তোমরা আমার পুরুত হবে কিন্তু। তোমাদের শিষ্যদের নিয়ে আসবে।'

মুনিরা সে কথায় 'যে আজ্ঞা' বলে চলে যেতেই শিব বিয়ের আয়োজন করবার জন্য তাঁর ভূতপ্রেত নিয়ে কৈলাস পর্বতে চলে এলেন। তারপর তিনি নারদকে ডেকে বললেন, 'নারদ, বিয়ের ঠিক করেছি, কনে হচ্ছেন হিমালয়ের মেয়ে পার্বতী। এখন তুমি একটি কাজ কর তো, দেবতাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে এস। মুনি ঋষিদেরও বলবে। যক্ষ গন্ধর্বেরাও যেন বাদ না পড়ে। সকলকেই আসতে হবে, যে না আসবে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে।'

নারদ মুনি যেমন-তেমন চালাক লোক ছিলেন না, শিবের হুকুম মত সব কাজ করে ফেললেন।

ততক্ষণে কৈলাস পর্বতে খুবই ধুমধাম পড়ে গেছে, ভূতেরা ঢাক, ঢোল, শিঙা, শানাই, কাঁসর, করতাল সব বাজিয়ে সৃষ্টি মাথায় করে তুলেছে। তাদের মুখে আজ আর হাসি ধরে না! ক্রমে দেবতারাও একজন দুজন করে এসে উপস্থিত হলেন। হাঁসে চড়ে ব্রহ্মা এলেন, গরুড়ে চড়ে বিষ্ণু এলেন। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ কেউ আসতে বাকি রইলেন না। গন্ধর্ব আর অপ্সরারা তো এর ঢের আগেই এসে গান বাজনা জুড়ে দিয়েছে। শিবও সেই কখন থেকে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বরের বেশে তাঁকে কী সুন্দরই দেখাচ্ছে।

তারপর সকলে শিবকে নিয়ে রওনা হলেন। দেবতারা নিজ-নিজ দল নিয়ে বরের আগে যেতে লাগলেন, বাজনদারেরা মাথা দুলিয়ে নাচতে নাচতে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে চলল।

এদিকে হিমালয়ও চুপ করে বসে থাকেন নি। পার্বতীকে নাইয়ে সাজিয়ে তাঁরাও প্রস্তুত হয়ে আছেন। বাড়িঘর সাজিয়ে, তোরণ বানিয়ে, নিশান উড়িয়ে স্বপ্নপুরীর মত সুন্দর করা হয়েছে। পর্বতেরা সকলে সেজেগুজে সপরিবারে এসে কাজকর্মে ব্যস্ত রয়েছেন। শিবকে এগিয়ে আনবার জন্য স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বত কখন বেরিয়ে গেছেন। বর এলে তাকে আদর করে আনতে হবে, সেজন্য নিজে হিমালয় ফটকে দাঁড়িয়ে।

বাড়ির ভিতরেও অবিশ্যি কেউ চুপ করে নেই। মেয়েদের আজ বড়ই আনন্দ আর উৎসাহ। পার্বতীর মা মেনকা দেবী তো আনন্দে মাথা ঠিকই রাখতে পারছেন না। তিনি এর মধ্যে নারদ মুনিকে সঙ্গে করে গিয়ে ছাদে উঠে আছেন,—যার জন্যে মেয়ে এত তপস্যা করলেন, সেই শিবকে সকলের আগে দেখতে হবে। সাধারণ দেবতারাই যখন দেখতে এত সুন্দর শিব না জানি তবে কত সুন্দর!

এমন সময় গন্ধর্বের রাজা বিশ্ববসু এলেন। তিনি দেখতে খুবই সুন্দর, তাঁকে দেখে মেনকা বললেন, 'এই বুঝি শিব!' নারদ তাতে হেসে বললেন, 'না না—ও তো আমাদের বাজনদার, ও কেন শিব হবে?' তা শুনে মেনকা তো থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, ভাবলেন, 'বাজনদারই দেখতে এমন, শিব না জানি তবে কেমন!'

তারপর এলেন যক্ষদের নিয়ে কুবের, তিনি গন্ধর্বের রাজার চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা বললেন, 'তবে এই শিব!' নারদ বললেন, 'না।' শুনে মেনকা আরো আশ্চর্য

হলেন। তারপর এলেন বরুণ, তিনি কুবেরের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর, তারপর এলেন যম, তিনি বরুণের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর, তারপর এলেন ইন্দ্র, তিনি যমের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা এঁদের একেকজনকে দেখেন আর ভারি খুশি হয়ে বলেন, 'এ নিশ্চয় শিব!' আর নারদ তাতে 'না' বললে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাতে থাকেন।

এমনি করে সূর্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি সকলকে দেখেই মেনকা বললেন, 'এই শিব!' যখন শুনলেন যে এঁদের কেউ শিব নন, শিব এঁদের চেয়েও বড়, তখন তাঁর এতই আশ্চর্য বোধ হল যে তিনি আর ভাবতেই পারলেন না, শিব তবে কত সুন্দর।

এমন সময় ভূতপ্রেত ব্রহ্মদৈত্য সব নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। এত ভূত আর মেনকা কখনো একসঙ্গে দেখেন নি, তাদের সেই বিকট ভেঙচি দেখেই মাথা ঘুরে গেল। তাদের সঙ্গে যে আবার পাঁচমুখো একটা কে ষাঁড়ে চড়ে এসেছে,—মাথায় জটা, পরনে বাঘছাল, গায়ে ছাই মাখা, গলায় মড়ার মাথা—সে-কথার খবর নেবার খেয়ালই তাঁর রইল না। তখন নারদ সেই দেবতাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—'এই শিব!'

যেই এই কথা বলা অমনি মেনকা 'ও লক্ষ্মীছাড়ী পোড়ারমুখী পার্বতী! করেছিস কী!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। শিব সে কথা জানতে পেরে ছুটে এসে মেনকার মাথায় জল ঢেলে অনেক হাওয়া করতে শেষে তাঁর জ্ঞান হল।

তখন তিনি শিবকে আর নারদকে কী বকুনিটাই না বকলেন! নারদের অপরাধ ছিল এই যে তিনি বলেছিলেন, 'শিব বড় ভাল, তাঁর সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে।' বকতে বকতে তাঁর সেই সাত মুনির কথা মনে হল যাঁরা পার্বতীর বিয়ে ঠিক করতে এসেছিলেন। অমনি তিনি তাঁদের উপর যারপরনাই চটে বললেন, 'বেটারা গেল কোথায়। আজ তাদের দাড়ি ছিঁড়তে হবে!' আবার মাথায় চাপড় মেরে বললেন, 'আর তাদেরই বা দোষ কী! ঐ অভাগী মেয়েই তো যত নষ্টের গোড়া!' এই বলে তিনি পার্বতীকে কত গালই দিলেন। শেষে তিনি বললেন, 'আমি কিছুতেই এই কদাকার বুড়োর কাছে মেয়ে দেব না। ওর না আছে টাকা, না আছে গুণ, না জানে লেখাপড়া, না পারে একটা ঘোড়া কিনে চড়তে!'

তখন সকলে মিলে মেনকাকে কত বুঝালেন, কারো কথায় কিছু হল না। পার্বতী নিজে এসে একবার তাঁকে মিনতি করে দুটো কথা বলেছিলেন, তাতে তিনি দাঁত কড়মড়িয়ে ক্ষেপে উঠে পার্বতীকে এমন কিল আর কনুয়ের গুঁতো মারতে লাগলেন যে, নারদ মুনি তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ছাড়িয়ে না নিলে সেদিন ভারি মুশকিলই হত আর কি!

যা হোক, শেষে বিষ্ণু এসে অনেক উপদেশ দিতে মেনকার মন একটু শান্ত হল। ঠিক সেই সময়ে নারদও শিবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁর চেহারাটা অনেকটা শুধরিয়ে এনে মেনকার সামনে উপস্থিত করলেন। তখন মেনকা দেখলেন যে, শিবের মাথায় জটা আর গায় ছাই বলে তাঁকে উষ্কখুষ্ক দেখায় বটে, কিন্তু আসলে তিনি সকল দেবতার

চেয়ে সুন্দর। মেনকা যতই শিবের মুখের দিকে তাকান, ততই তাঁর মনে হয় যে 'আহা, কী মিষ্টি! কী সরল!'

এমনি ভাবে মেনকা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে শিবের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'আহা! আমার পার্বতীর কপাল ভাল যে এমন স্বামী পেয়েছে!' তা শুনে শিবের ভারি লজ্জা হওয়ায় তিনি জড়সড় হয়ে দেবতাদের কাছে চলে গেলেন।

এদিকে মেয়েদের মহলে ভয়ানক ছুটাছুটির ধুম লেগে গেছে। সবাই বলছে, 'আরে দেখ এসে, পার্বতীর কী সুন্দর বর হয়েছে! তারা যে যেমন ছিল তেমনিভাবে, কেউ রান্না ফেলে, কেউ কলসি কাঁখে, কেউ চুল বাঁধতে বাঁধতে, কেউ ঘোমটা টানতে টানতে, কেউ আছাড় খেতে খেতে এসে উপস্থিত হল। শিবকে তারা চন্দন দিয়ে, খৈ দিয়ে আরো কত রকমে পূজা যে করল তা কী বলব। তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাসা কত হল, তার অন্ত নাই। মেনকা অবধি এসে তাতে যোগ না দিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি শিবের পিছনে গিয়ে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে টানতে আরম্ভ করেছিলেন, দেবতারা দেখে ফেলায় হাসতে হাসতে ঘরে পালিয়ে গেলেন।

তারপর শিবকে রেশমী কাপড় পরিয়ে, তাঁর গলায় সোনার ফুলের মালা, কপালে তিলক দিয়ে তাঁকে আর পার্বতীকে বিয়ের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। মুনিরা বেদ পড়তে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দিয়ে বিয়ের সকল কাজ করিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর কথায় মেয়েরা এসে শিব আর পার্বতীর কপালে খৈ ছড়িয়ে দিতে লাগল। আর গন্ধর্ব আর অপ্সরারা মিলে গানবাজনা যে খুবই করল, তার আর কথাই নাই।

এমনি করে শিব আর পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল। হিমালয় দেবতাদের সকলকে এমনি আদর অভ্যর্থনা করলেন যে, তাঁদের লাজে মাথা হেঁট করে থাকতে হল। তাঁরা হিমালয়কে কত আশীর্বাদ যে করলেন তার লেখা-জোখা নাই। তখন মেনকা লাজে জড়সড় হয়ে তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'ঠাকুর! আপনাদের কাছে আমি ভারি পাগলামি করেছি, আমার বড় অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করতে হবে।' দেবতারা হেসে বললেন, 'আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যা করেছেন তাতে আমরা আমোদই পেয়েছি। আপনার দিন-দিন সৌভাগ্য বাড়তে থাকুক।'

তখন আবার বাজনা বেজে উঠল, সকলে সেজে প্রস্তুত হল, দেবতারা মনের সুখে বরকনে নিয়ে কৈলাসে যাত্রা করলেন। হিমালয় আর মেনকা সকলকে নিয়ে তাঁদের গন্ধমাদন পর্বত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে ভাবলেন, 'হায়, সব যে অন্ধকার! কোথায় গেল আমাদের পার্বতী!'

গণেশ

শিবের সঙ্গে যখন পার্বতীর বিবাহ হইল তখন পার্বতী কৈলাস পর্বতে আসিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। শিব খেয়ালশূন্য লোক, তাহাতে আবার ভূতের দল নিয়া থাকিতেন—মেয়েরা বাড়িতে থাকিলে কেমন করিয়া চলাফেরা করিতে হয় সেদিকে তাঁহার নজর একটু কম। যখন-তখন তিনি তাঁহার ভূতদের নিয়া বাড়ির ভিতর আসিয়া উপস্থিত হন, পার্বতী আর তাঁর সখীদের তাহাতে বড় অসুবিধা হয়। দারোয়ান নন্দী তাঁহাকে মানা করিলেও তিনি তাহা শোনেন না, তাঁহাকে ধমকাইয়া ঠিক করিয়া দেন।

পার্বতীর সখী জয়া আর বিজয়া ক্রমাগত বলেন, 'ইহারা সকলেই শিবের লোক, কাজেই তাঁহার ধমকে ভয় পায়। আমাদের নিজের একটি ভাল লোক হইলে বেশ ভাল হইত।' এ কথায় পার্বতী কাদা দিয়া যারপরনাই সুন্দর একটা খোকা তৈয়ার করিলেন তাহার নাম হইল গণেশ। সেই খোকাটিকে তিনি সুন্দর পোশাক আর গহনা পরাইয়া দারোয়ান সাজাইয়া লাঠি হাতে দিয়া দরজায় বসাইয়া দিলেন। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে বসে আমি কী করব?' পার্বতী বলিলেন, 'বাবা, তুমি এখানে দারোয়ান হবে, কাউকে ঢুকতে দেবে না।'

এই বলিয়া গণেশের মুখে বার বার চুমা খাইয়া পার্বতী স্নান করিতে গেলেন আর তাহার খানিক পরেই শিব তাঁহার ভূতপ্রেত লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গণেশ দরজা ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, 'কোথা যাচ্ছ? থামো, মা স্নান করছেন।' বলিয়াই তিনি লাঠি তুলিলেন। শিব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'আরে আমি শিব!' গণেশ বলিলেন, 'শিব আবার কে? তুমি কেন যাবে?' শিব বলিলেন, 'এ তো দেখছি ভারি রোখা! আরে, আমি পার্বতীর স্বামী!' বলিয়া তিনি যেই ঢুকিতে যাইবেন অমনি গণেশ ধাঁই করিয়া তাঁর পিঠে লাঠি মারিয়া বসিয়াছেন।

তখন তো বড়ই বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। শিবের হুকুমে তাঁহার ভূতেরা আসিয়া গণেশকে শাসাইতে লাগিল। গণেশ তাহাদের বিকট চেহারা দেখিয়া একটুও ভয় পাইলেন না। তিনি বলিলেন, 'বাঃ! মুখের ছিরি দেখ! যা বেটারা এখান থেকে!'

ভূতেরা বড়ই মুশকিলে পড়িল। তাহাদের হাসিও পাইয়াছে, রাগও হইয়াছে, আবার ভয়ও হইয়াছে। তাহারা এক-একবার শিবের কাছে ফিরিয়া যায়, আবার তাঁহার তাড়া খাইয়া গণেশের কাছে আসিয়া দাঁত খিঁচায়। গণেশ লাঠি লইয়া তাড়া করিলে আবার শিবের কাছে ছুটিয়া যায়। যাহা হউক, শেষে তাহারা শিবের কথায় খুব সাহস পাইয়া গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। নন্দী আর ভৃঙ্গী দুজনে আসিয়া

তাঁহার দুই পা ধরিয়া দিল টান, আর গণেশ ঠাস-ঠাস করিয়া তাদের দুজনকে মারিলেন দুই থাপ্পড়। তারপর দরজার হুড়কা লইয়া ভূতের দলকে তিনি এমনি ঠেঙ্গাইলেন যে কী বলিব।

এদিকে নারদ মুনি গিয়া দেবতাদিগকে এই যুদ্ধের সাংবাদ দিয়াছেন, দেবতারাও সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মুনি, ঋষি, অপ্সরা, কেহই আসিতে বাকি নাই। শিব তখন ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, দেখ তো ঐ ছেলেটিকে বলিয়া কহিয়া শান্ত করিতে পার কি না।

শিবের কথায় ব্রহ্মা মুনি ঋষিদিগকে লইয়া গণেশকে শান্ত করিতে গেলেন। গণেশ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি ভূত আসিয়াছে, কাজেই বুঝিতে পার—ব্রহ্মার মুখে যত দাড়ি ছিল সব তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মা যত চ্যাঁচান 'দোহাই বাবা আমাকে মারিও না, আমি যুদ্ধ করিতে আসি নাই,' গণেশ ততই আরো বেশি করিয়া তাঁহার দাড়ি ছেঁড়েন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে দরজার হুড়কা লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিলেন। তখন আর কাহারও সেখানে থাকিতে ভরসা হইল না, সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে শিবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তারপর সকল দেবতা আর ভূত মিলিয়া গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ করিল, সে বড়ই ভীষণ।

পার্বতী দেখিলেন যে, গণেশের বড়ই বিপদ উপস্থিত, এখন আর শুধু লাঠি হুড়কা লইয়া যুদ্ধ করিলে চলিবে না, তাই তিনি দুইটা ভয়ঙ্কর শক্তি তৈয়ার করিয়া গণেশকে দিলেন।

তাহার একটার মুখ এমনি বিকট যে সে হাঁ করিলে পাহাড় পর্বত গিলিয়া ফেলিতে পারে। আর একটা বিজলীর মত ঝলমল করে, আর তাহার যে কত হাজার হাত তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সেই দুই শক্তি দেবতাদের সকল অস্ত্রকে গিলিয়া ফেলিতে লাগিল, কাজেই গণেশের গদার সামনে কেহই টিকিতে পারিল না। দেবতা আর ভূত সকলকেই পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। তাঁহারা কত যুদ্ধ করিয়াছেন, আরো কত যুদ্ধ দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন বিপদে আর কখনও পড়েন নাই। তখন শিব আর বিষ্ণু পরামর্শ করিলেন যে, এই ছেলেটাকে ছল করিয়া মারিতে না পারিলে আর উপায় নাই। বিষ্ণু শিবকে বলিলেন, 'আমি সম্মুখ হইতে যুদ্ধ করিয়া ইহাকে ভুলাইয়া রাখিব। সেই সময় তুমি পিছন হইতে ইহার প্রাণ বধ করিবে।'

এই বলিয়া বিষ্ণু মায়ার বলে গণেশের শক্তি দুটিকে অবশ করিয়া দিলেন, কিন্তু গণেশ তাহাতে ভয় না পাইয়া এমনই গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা সামলাইতে বিষ্ণু অস্থির। তাহা দেখিয়া শিব মহা রাগে ত্রিশূল হাতে লইলেন। কিন্তু গণেশের গদার ঘায় তাহা তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। তাহাতে তিনি পিনাক (শিবের ধনুক) হাতে নিলেন, তাহাও গণেশের গদার ঘায় পড়িয়া গেল, আর সেই অবসরে গণেশ তাঁহার পাঁচখানি হাত কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর গণেশ আবার বিষ্ণুকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন, বিষ্ণুর চক্রে ঠেকিয়া তাহা গুঁড়া হইয়া গেল। এমনি করিয়া যেই

গণেশ আবার বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হইয়াছেন, অমনি শিব পিছন হইতে আসিয়া ত্রিশূল দিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

হায়! এই নিদারুণ শোক পার্বতী কিরূপে সহ্য করিবেন? তিনি রাগে আর দুঃখে অস্থির হইয়া এক হাজারটা এমন ভয়ঙ্কর শক্তি তৈয়ার করিলেন যে তাহারা দেখিতে দেখিতে সকল সৃষ্টি নাশ করিবার যোগাড় করিল। শিবের কোমর ভাঙিয়া দিল, অন্য দেবতাদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিল, সে যে কী ভীষণ কাণ্ড তাহা আর বলিবার নয়।

তখন শুধু আর হাতজোড় ভিন্ন উপায় কী! কিন্তু পার্বতীর কাছে আসিতে কাহারও ভরসা হয় না, তাই দূরে থাকিয়াই দেবতাগণ প্রাণপণে সে কাজ করিতে লাগিলেন। অনেক কান্নাকাটির পর শেষে পার্বতী তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আচ্ছা, গণেশকে যদি বাঁচাইয়া দাও, আর সকল দেবতার আগে তাহার পূজা হয়, তবে আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিব।'

একথা শুনিয়া শিব সকলকে বলিলেন, 'শীঘ্র তাই কর, নহিলে আর রক্ষা নাই!' অমনি সকলে গণেশকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারি এক মুশকিল উপস্থিত,—গণেশের মাথাটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাহাতে শিব বলিলেন, 'তোমরা গণেশের শরীর ধুইয়া তাহার পূজা কর, আর কয়েকজন উত্তর-দিকে যাও। সেদিকে গিয়া প্রথমে যাহাকে দেখিতে পাইবে তাহারই মাথাটা কাটিয়া আনিয়া গণেশের দেহের সঙ্গে জুড়িয়া দাও।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিকে সকলে ছুটিল, আর অনেক দূর গিয়াই একটা এক-দাঁত-ওয়ালা সাদা হাতি দেখিতে পাইল। হাতি হউক আর যাহাই হউক, উহারই মাথা কাটিয়া নিয়া গণেশর দেহে জুড়িতে হইবে কাজেই আর কী করা যায়? সেই হাতির মাথা আনিয়া গণেশের দেহে জুড়িয়া মন্ত্র পড়িতেই গণেশ উঠিয়া বসিলেন। তখন পার্বতীরও রাগ দূর হইল, দেবতাদেরও বিপদ কাটিল। সেই অবধি গণেশের হাতির মাথা, আর সেই অবধিই সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা হয়।

গণেশের বিবাহ

গণেশ কেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বলিয়াছি, গণেশের বিবাহ কেমন করিয়া হইয়াছিল আজ তাহা বলিব।

যুদ্ধের পর হইতে শিব গণেশকে যারপরনাই স্নেহ করতেন, আর পার্বতীর তো কথাই নাই। কার্তিক যেমন শিব আর পার্বতীর পুত্র, গণেশ তাঁদের তেমনি পুত্র হইলেন, আর তাঁদের নিকট তেমনি স্নেহ পাইতে লাগিলেন।

কার্তিক আর গণেশ যখন বড় হইলেন, তখন একটা কথা লইয়া দু-জনের মধ্যে

বড়ই তর্ক উপস্থিত হইল ; কার্তিক বলেন, 'আমি আগে বিবাহ করিব,' গণেশ বলেন, 'না, আমি আগে বিবাহ করিব !'

তাঁহাদের এইরূপ তর্ক শুনিয়া শিব আর পার্বতী বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। দুই পুত্রকেই তাঁহারা সমান স্নেহ করেন ; ইঁহাদের কাহাকে চটাইয়া কাহার বিবাহ আগে দেন ? শেষে অনেক ভাবিয়া শিব স্থির করিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া [অর্থাৎ তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া] আসিতে পারিবে, তাহার বিবাহই আগে দিব।'

একথা শুনিয়া কার্তিক তখনই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন।

গণেশের এই বড় ভুঁড়ি, তাহা লইয়া ছটাছুটি করিবার সুবিধা নাই ; তিনি ভাবিলেন, তাই তো এখন করি কী ? ক্রোশখানেক যাইতে না যাইতেই আমার হাঁপ ধরে, পৃথিবীর চারিদিকে আমি কী করিয়া ঘুরিব ?'

যাহাই হউক, গণেশ বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি মনে মনে এক চমৎকার যুক্তি স্থির করিয়া, স্নানের পর দুইখানি আসন হাতে পিতামাতার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'বাবা, মা, এই দুখানি আসনে আপনারা দুজনে বসুন, আমি আপনাদের পূজা করিব।'

এ কথায় শিব আর পার্বতী সন্তুষ্ট হইয়া দুই আসনে দুইজন বসিলেন। গণেশও ভক্তির সহিত তাঁহাদের পূজা করিয়া, সাতবার তাঁহাদের চারিদিকে ঘুরিলেন। তারপরে জোড় হাতে তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'এখন তবে আমার বিবাহ দিন !'

শিব কহিলেন, 'বাবা, আমি তো বলিয়াছি, কার্তিকের আগে যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পার, তবে তোমার বিবাহই আগে দিব।'

তাহাতে গণেশ বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমি যে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলাম, তবে কেন এমন কথা বলিতেছেন ?'

শিব কহিলেন, 'তুমি কখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে ?'

গণেশ বলিলেন, 'এই যে আমি আপনাদের পূজা করিয়া সাতবার আপনাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়াছি। বেদে আর শাস্ত্রে আছে যে, পিতামাতাকে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে তাহাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই। বেদের কথা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য আমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে। সুতরাং আমার শীঘ্র বিবাহ দিন, নচেৎ বেদের কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে।'

এ কথায় শিব যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'তাই তো বাবা, তুমি তো ঠিক কথাই বলিয়াছ। বেদে আর শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাই তুমি করিয়াছ, সুতরাং তোমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে বৈকি !'

তখনই গণেশের বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। দুটি কন্যাও পাওয়া গেল, রূপে গুণে কুলে শীলে সকলের চেয়ে ভাল ; নাম সিদ্ধি আর বুদ্ধি। সুতরাং বিবাহ হইতে আর বিলম্ব হইল না।

এদিকে হইয়াছে কি, গণেশের বিবাহের কিছুদিন পরে কার্তিক প্রাণপণে

পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছেন, আর অমনি নারদ মুনি আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'দেখিলে ইঁহাদের কাজ ? তোমাকে ফাঁকি দিয়া তোমার পিতামাতা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পাঠাইলেন, আর সেই অবসরে গণেশের বিবাহ দিলেন। শাস্ত্রে বলে এমন মা-বাপের মুখ দেখিতে নাই, এখন তোমার যেমন ভাল মনে হয়, কর।'

এই বলিয়া যেই নারদ বিদায় হইলেন, অমনি কার্তিকও শিব-পার্বতীকে প্রণাম করিয়া রাগের ভরে ক্রৌঞ্চ পর্বতে চলিয়া গেলেন।

শিব আর পার্বতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'কোথায় যাইতেছ বাছা ? তোমার যে বিবাহ ঠিক করিয়াছি।'

কার্তিক কি তাহাতে থামেন ? তিনি বলিলেন, 'না, আমি এখানে আর থাকিব না ; আপনারা আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন!'

সুতরাং কার্তিকের আর বিবাহ হইল না ; এইজন্যই তাঁহার আর এক নাম হইয়াছে 'কুমার'।

ইহাতে শিব আর পার্বতীর মনে কিরূপ কষ্ট হইল, বুঝিতেই পার। তাঁহারা কার্তিককে ফিরাইতে না পারিয়া নিজেরাই ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্তিকের কিনা বড়ই রাগ হইয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার পিতামাতাকে আসিতে দেখিয়া ক্রৌঞ্চ পর্বতে থাকিতে চাহিলেন না। দেবতারা অনেক বলিয়া কহিয়া সেখান হইতে বার ক্রোশের মধ্যে থাকিতে তাঁহাকে রাজী না করাইলে না জানি তিনি কোথায় চলিয়া যাইতেন।

ইন্দ্র হওয়ার সুখ

দেবতাদের যিনি রাজা, তাঁহাকে বলে ইন্দ্র। তাঁহার কথা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তাঁহার এক হাজার চক্ষু আর সবুজ রঙের দাড়ি ছিল ; তাঁহার আসল নাম শত্রু, পিতার নাম কশ্যপ, রাণীর নাম শচী, পুত্রের নাম জয়ন্ত, হাতির নাম ঐরাবত, ঘোড়ার নাম উচ্চৈঃশ্রবা, সারথির নাম মাতলি, সভার নাম সুধর্মা, বাগানের নাম নন্দন আর অস্ত্রের নাম বজ্র। তাঁহার সভায় গন্ধর্বেরা গান গাহিত, অপ্সরারা নাচিত।

লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড়ই সুখে থাকেন, আর অনেক সময়ই যে তিনি খুব জাঁকজমকের ভিতর দিন কাটাইতেন, একথা সত্যও বটে। কিন্তু সময় সময় তাঁহাকে বেগও কম পাইতে হইত না। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল, আর সেই সূত্রে অসুরেরা মাঝে মাঝে ইন্দ্রকে বড়ই নাকাল করিত। দেবতা-অসুরের যুদ্ধে একবার বৃত্র নামে একটা অসুর ইন্দ্রকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল। দেবতারা তখন অনেক বুদ্ধি করিয়া সেই অসুরটাকে 'জৃম্ভিকা' অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারেন, তাই ইন্দ্র রক্ষা

পান, নচেৎ সে-যাত্রা আর তাঁহার বিপদের সীমাই ছিল না। জৃম্ভিকা অস্ত্রের গুণ আশ্চর্য। সে অস্ত্র গায়ে লাগিবামাত্র অসুররা ভয়ানক হাই তুলিল, আর ইন্দ্র সেই ফাঁকে তাহার পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই যুদ্ধ ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতেই আবার ইন্দ্রের এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্বে কোন কারণে তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বৃত্রের মৃত্যুর পরে সেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বেচারা ভয়ে অস্থির হইয়া যেখানেই পালাইতে যান, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। শেষে আর উপায় না দেখিয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে পদ্মের মৃণালের ভিতর গিয়া সূতা হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। কাজেই তখন ব্রহ্মহত্যা ঠেকিয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে তাঁহাকে সহজে ছাড়ে নাই। সে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বৎসর সেইখানেই তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল।

সাড়ে তিন লক্ষ বছর তো আর একদিন দুইদিনের কথা নয়, দেবতার হিসাবেও তাহা এক হাজার বৎসর। কাজেই দেবতারা তাঁহাকে একদিন দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তভাবে খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মার কথায় যদিও তাহার সন্ধান পাইলেন তথাপি তাঁহাকে ঘরে আনিতে সাহস পান নাই, কারণ ব্রহ্মহত্যা তখনও তাঁহার জন্য সেখানে বসিয়া আছে। সে তাঁহাকে সহজে ছাড়িবে কেন? তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোন পবিত্র নদীতে স্নান করাইয়া ইন্দ্রের শরীরের পাপ ধুইয়া ফেলিবেন। তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে গৌতমী নদীতে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। গৌতম যারপরনাই রাগিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'সে হইবে না, এই পাপীকে এখানে স্নান করাইলে আমি তোমাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব! তোমরা শীঘ্র এখান হইতে যাও।'

এই কথায় দেবতারা নর্মদার জলে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম ছিল। মাণ্ডব্য মুনি বিষম ভ্রূকুটির সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'এখানে যদি ইহাকে স্নান করাও তবে এখনি তোমাদের শাপ দিয়া ভস্ম করিব!'

যাহা হউক, শেষে দেবতারা অনেক স্তুতি মিনতি করায় মাণ্ডব্য ইন্দ্রকে সেখানে স্নান করাইতে দিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌতমীতে নিয়াও স্নান করানো হইল। ইহার পর আবার ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলুর জল দিয়া ইন্দ্রকে ধুইলেন, তবে সে-যাত্রার মত তিনি একটু নিশ্চিন্ত হলেন।

বাস্তবিক, ইন্দ্র হওয়া আগাগোড়াই সুখের কথা ছিল না। কিন্তু লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড় সুখী। তাই অনেকে ইন্দ্র হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিত। সেজন্য কাহাকেও কঠোর তপস্য করিতে দেখিলেই ইন্দ্র ভাবিতেন—সর্বনাশ! এইবার বুঝি বা আমার কাজটি যায়! তখন তিনি লোকটির তপস্যা ভাঙিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক একজন লোক ইন্দ্র হইয়া যাইত।

নহুষ নামে এক রাজা একবার ইন্দ্র হইয়া কী হুলস্থুলই বাধাইয়াছিলেন। উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতে তাঁহার মন উঠিল না, তিনি বলিলেন, 'আমি বড় বড় মুনিদের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়াইব।'

অমনি এক আশ্চর্য পাল্কী প্রস্তুত হইল, মুনিরা হইলেন তাহার বেহারা। সে বেচারাদের গায় জোর কম। ফলমূল খাইয়া থাকেন, পাল্কী বহার অভ্যাস কাহারও নাই, তাঁহাদের কাজে নহুষের মন উঠিবে কেন? নহুষ তখন বেজায় চটিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মাথায় ধাঁই শব্দে এক প্রচণ্ড লাথি লাগাইয়া দিলেন। তাহার ফলও পাইলেন হাতে হাতেই, কেননা তাহার পরমুহূর্তেই মুনির শাপে তাঁহার সেই সুখের ইন্দ্রগিরি ঘুচিয়া গেল, আর তিনি এক প্রকাণ্ড সাপ হইয়া হিমালয়ের নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

আর একবার অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল, কিন্তু কেহই জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না। সেই সময় পৃথিবীতে রজি নামে একজন অতিশয় ক্ষমতাশীল রাজা ছিলেন। দুই দলই ভাবিলেন, 'এই রজিকে আনিয়া আমাদের সঙ্গে জুটাইতে পারিলে আমরা নিশ্চয় জিতিব।'

এই ভাবিয়া দেবতারা রজিকে আনিয়া বলিলেন, 'হে রাজন, তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিয়া অসুর বধ কর, নহিলে কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না!'

রজি বলিলেন, 'আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিতে পারি।'

দেবতারা বলিলেন, 'তোমাকে আমরা ইন্দ্র করিব, তুমি শীঘ্র আইস!'

এই বলিয়া দেবতারা সকলে চলিয়া গিয়াছেন, অমনি অসুরেরা আসিয়া রজিকে বলিল, 'মহারাজ, আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন।'

রজি দেবতাদিগকে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি অসুরদিগকেও বলিলেন, 'আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের কথায় রাজী আছি।'

কিন্তু অসুরেরা সে কথায় অতিশয় ঘৃণার সহিত বলিলেন. 'এমন সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন নাই! আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ, আর কোন ইন্দ্র আমরা চাই না। আপনি না হয় আমাদের পক্ষে নাই আসিলেন!'

তখন রজি দেবতাদের সঙ্গে জুটিয়া ভয়ানক রাগের সহিত অসুর মারিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেবতাদের জয়লাভ হইল। ইন্দ্র দেখিলেন, এখন তো বড়ই বিপদ উপস্থিত, রজিকে এখন সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তিনি রজি নিজে কিছু বলিবার আগেই তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ! লোকে বলে, যে ভয় হইতে রক্ষা করে সে পিতা। আপনি আমাকে ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই আপনি আমার পিতা হইলেন। আর তাহাতেই আপনি ইন্দ্রও হইলেন, কেন না ইন্দ্রের পিতা হইলে আর ইন্দ্র হওয়ার চেয়ে বেশি বই কম কী হইল?'

রজিও ইন্দ্রের সেই ফাঁকিতে ভুলিয়া আহ্লাদের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিলেন,

স্বর্গের রাজা হওয়ার কথা আর মুখে আনিলেন না।

এই রজির পাঁচশত মহাবীর পুত্র ছিল। রজির মৃত্যুর পর এই পাঁচশত বীর মিলিয়া যুক্তি করিল যে, 'দেবতারা ফাঁকি দিয়া আমাদের পিতাকে ইন্দ্রপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, আইস, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার শোধ লইব।'

এই বলিয়া তাহারা দেবতাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, আর দেখিতে দেখিতে দলবল সহিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গ আর পৃথিবী দুইই দখল করিয়া বসিল।

এই পাঁচশত ভাই যেমন বীর, তেমনি যদি বুদ্ধিমান হইত তবে ইন্দ্রের নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার কোন উপায় থাকিত না। কিন্তু ইহারা বুদ্ধিমানের মত ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্য পালন করার বদলে নানরূপ অসৎ কার্যে নিজেদের বিষয় ও বল নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার ফলে, অল্প দিনের ভিতরে তাহাদিগকে তাড়াইয়া ইন্দ্র আবার আসিয়া স্বর্গের রাজা হইলেন।

ইন্দ্র হওয়ার যে কী সুখ, তাহার সম্বন্ধে আর একটা মজার গল্প আছে। একবার অসুরেরা ঘোরতর যুদ্ধে দেবতাদিগকে যারপরনাই ব্যস্ত করিয়া তুলিলে, তাঁহারা সূর্যবংশের রাজা পরঞ্জয়কে আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি আমাদের হইয়া অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।'

পরঞ্জয় কহিলেন, 'আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি যদি আপনারা আমার একটি কথায় রাজী হন। আপনাদের যিনি ইন্দ্র, আমি তাঁহার কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করিব।'

এ কথায় ইন্দ্র আর অন্য দেবতারা সকলেই বলিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাহাই হইবে, তুমি আইস!'

তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ইন্দ্র বিশাল ষাঁড় সাজিয়া পরঞ্জয়কে কাঁধে করিয়া লইলেন, পরঞ্জয় তাহাতে ভারী খুশী হইয়া দুই দণ্ডের মধ্যে অসুর শেষ করিলেন। সেই ষাঁড়ের ককুদ্ অথবা কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করায় তখন হইতে পরঞ্জয়ের নাম হইল 'ককুৎস্থ'। দশরথের পুত্র রাম এই বংশের লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও অনেক সময়ে বলা হয় 'কাকুৎস্থ'।

ইন্দ্রগিরির মজার আর এক গল্প বলিয়া শেষ করিব। একজন অতি বিখ্যাত মুনি ছিলেন, তাঁহার নাম আত্রেয় [অত্রি মুনির পুত্র]। ঠাকুরটি বিস্তর যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন আর তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামত সংসারের সর্বত্র চলা-ফেরার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

একদিন তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে ইন্দ্রের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শোভা দেখিয়া, গীত শুনিয়া আর ময়রাদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন খাইয়া ঠাকুরের মন এমনই ভুলিয়া গেল যে, তিনি দিনরাতই কেবল ভাবিতে লাগিলেন, আহা! এই তো সুখ, এমনি তো চাই!

তারপর আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া আর তাঁহার নিজের কুঁড়েঘরটি কিছুতেই তাঁহার

পছন্দ হয় না।

ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওগো, এ সব কী ছাই খাবার আমাকে খাইতে দাও ? এ সব কি খাইতে ভাল লাগে ? ইন্দ্রের বাড়িতে যে চমৎকার মিঠাই খাইয়া আসিয়াছি, ফল-মূলের তরকারি কিছুতেই তেমন করিতে পারিবে না।'

এই বলিয়া তিনি বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে, 'আমার এই আশ্রমটিকে ঠিক ইন্দ্রের পুরীর মত করিয়া দাও। নইলে তোমাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব। ঠিক তেমনি বাড়ি, তেমনি সভা, তেমনি বাগান, তেমনি হাতি, তেমনি ঝাড়-লণ্ঠন, তেমনি গান-বাজনা, তেমনি মিঠাই, মণ্ডা, লোকজন—সব অবিকল চাই। খবরদার ! যেন কোন কথায় একটু তফাত হয় না !'

শাপের ভয়ে বিশ্বকর্মা তখনই তাড়াতাড়ি সেখানে এক ইন্দ্রপুরী তৈয়ার করিয়া দিলেন। মুনিঠাকুর সেই পুরীতে থাকেন ; আর বলেন, 'আহা এই তো সুখ ! এই তো চাই !'

এমনিভাবে কিছুদিন যায়। ইহার মধ্যে অসুরেরা সেই পুরীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকায় আর বলে, 'দেখ ভাই, ইন্দ্র বেটা স্বর্গ ছাড়িয়া চুপিচুপি এখানে ঘর বাঁধিয়াছে ! চল, এইবেলা উহাকে মারিয়া বৃত্রকে মারিবার সাজাটা ভাল-মতো দিই !'

অমনি দলে দলে অসুর 'ইন্দ্র বেটারে মার ! ইন্দ্র বেটারে মার !' বলিতে বলিতে সেই পুরী ঘিরিয়া বসিল।

মুনিঠাকুর মনের সুখে খাটের উপর বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে অসুরদের বিকট চিৎকারে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে লাখে লাখে শেল, শূল, মুষল মুদগর, গাছ, পাথর আসিয়া তাঁহার সাধের পুরী চুরমার করিয়া দিতে লাগিল। দু-একটা তীরের খোঁচা যে না খাইলেন তাহা নহে।

তখন তাড়াতাড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে অসুরদের সামনে আসিয়া জোড়হাতে বলি-লেন, 'দোহাই বাবা, আমি ইন্দ্র নহি ! আমি মুনি, ব্রাহ্মণ ; অতি নিরীহ দীনহীন মানুষ, আমার উপর তোমাদের এত ক্রোধ কেন ?'

অসুরেরা বলিল, 'ইন্দ্র নহ ! তবে ইন্দ্র সাজিয়াছ কেন ? শীঘ্র তোমার এ সব সাজগোজ দূর করিয়া দাও !'

মুনি বলিলেন, 'এই যে বাপু ! এক্ষণই আমি এসব দূর করিয়া দিতেছি ! আমার নিতান্তই মাথা খারাপ হইয়াছিল তাই এমন বেকুবি করতে গিয়েছিলাম। আর কখনও এমন করিব না !'

তখন আবার বিশ্বকর্মার ডাক পড়িল।

বিশ্বকর্মা আসিলেন। মুনি বলিলেন, 'ভাই ! শীঘ্র এ সব দূর করিয়া আমার সেইরকম আশ্রম আবার বানাইয়া দাও, নইলে তো অসুরের হাতে আমার প্রাণ যায় দেখিতেছি !'

বিশ্বকর্মা দেখিলেন মুনির বড়ই বিপদ, কাজেই তিনি তাঁর কথামত কাজ

করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। দেখিতে দেখিতে সেই সোনার পুরীর জায়গায় আবার সেই কুঁড়েঘর আর বন হইল। অসুরদেরও রাগ থামিল, মুনিরও বিপদ কাটিল, বিশ্বকর্মাও হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

মহিষাসুর

একটা ভারি ভয়ঙ্কর অসুর ছিল। সে মহিষ সাজিয়া বেড়াইত, তাই সকলে তাহাকে বলিত মহিষাসুর।

দেবতারা কিছুতেই মহিষাসুরের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন; তাহাতে সে তাঁহাদিগকে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে আসিয়া ইন্দ্র হইল।

দেবতারা তখন আর কী করেন? তাঁহারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া মহাদেব আর বিষ্ণুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, 'হে প্রভু, মহিষাসুর তো আমাদের বড়ই দুর্দশা করিয়াছে, আমাদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে; এখন আপনারা যদি আমাদের রক্ষা না করেন, তবে আমাদের উপায় কী হইবে?'

অসুরদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া শিব ও বিষ্ণুর বড়ই রাগ হইল। সেই রাগে তাঁহাদের আর সকল দেবতাদের শরীর হইতে এমন একটা তেজ বাহির হইল যে, সে বড়ই আশ্চর্য! মনে হইল যেন আগুনের পর্বত আকাশ পাতাল ছাইয়া সকলের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই তেজ জমাট বাঁধিয়া একটি দেবীর মত হইল।

তাঁহাকে দেখিয়া দেবতাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। ইঁহারা সকলে মিলিয়া কেহ অস্ত্র, কেহ বল, কেহ বর্ম, কেহ অলঙ্কার আনিয়া তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। হিমালয় বিশাল এটা সিংহ আনিয়া তাঁহার বাহন করিয়া দিলেন।

দেবীর হাজরখানি হাতে দশদিক ছাইয়া গিয়াছে, তাঁহার মুকুট আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ভারে পৃথিবী বসিয়া পড়িয়াছে, ধনুর শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপিতেছে। তিনি যখন হাজার হাতে হাজার অস্ত্র লইয়া গর্জন করিলেন, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া উঠিল; অসুরেরা সেই গর্জন শুনিয়া ছুটিয়া আসিল।

তারপর কি যেমন তেমন যুদ্ধ হইল? মহিষাসুর নিজে যেমন ভয়ঙ্কর, তাহার এক-একটি সেনাপতিও তেমনি। তাহাদের একটার নাম চিকুর, একটার নাম চামর, আরগুলির নাম উদগ্র, মহাধনু, অসিলোমা, বাস্কল, পারিবারিত আর বিড়ালাক্ষ। এই সকল সেনাপতি আর কোটি কোটি অসুর লইয়া মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল। সকলে মিলিয়া অস্ত্র যে কত ছুঁড়িল তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

কিন্তু সে অস্ত্রে দেবীর কিছুই হইল না। তাঁহার এক এক নিশ্বাসে হাজার হাজার ভূত উপস্থিত হইয়া অসুরের দলকে ঠেঙাইয়া ঠিক করিতে লাগিল। দেবীর সিংহও আঁচড়-কামড় দিয়া তাহাদিগকে কম নাকাল করিল না। আর দেবীর নিজের তো কথাই নাই। তাঁহার হাজার হাতে হাজর অস্ত্র; সে অস্ত্রে তিনি অসুরদিগকে কাটিয়া, ফুঁড়িয়া, পিষিয়া, পুঁতিয়া শেষ করিতে লাগিলেন। সেনাপতিগুলির কোনটা দেবীর অস্ত্রের ঘায়, কোনটা তাঁহার কিলে আর চাপড়ে, কোনটা বা সিংহের কামড়ে মারা গেল। তখন আর মহিষাসুর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে শিং নাড়িয়া, লেজ ঘুরাইয়া গর্জন করিতে করিতে দেবীর ভূতগুলিকে এমন তাড়া করিল যে, তাহারা পালাইতে পারিলেই বাঁচিত, কিন্তু বাঁচিতে পারিতে তো পালাইবে! দেখিতে দেখিতে সে ভূতের দলকে শেষ করিয়া দেবীর সিংহের পানে ছুটিয়াছে—তাহার লেজের তাড়ায় সাগর লণ্ডভণ্ড, শিংএর নাড়ায় মেঘ সব খণ্ড-খণ্ড হইতেছে, নিশ্বাসের চোটে পাহাড় পর্বত উড়িয়া যাইতেছে। এমন সময় দেবীর সাপ অস্ত্র আসিয়া তাহাকে এমনই বাঁধনে বাঁধিল যে আর তাহার নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু, অসুরের মায়া, সে কি সহজ কথা? চোখের পলকে মহিষটা সিংহ হইয়া বাঁধন ছড়াইয়া লইল। দেবী তখনই সেই সিংহকে কাটিলেন। অমনি দেখা গেল যে, আর সিংহ নাই, তাহার জায়গায় খড়্গ হাতে একটা মানুষ ক্ষেপিয়া আসিতেছে। মানুষ কাটা যাইতে না যাইতে কোথা হইতে এক হাতি আসিয়া দেবীর সিংহকে শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে। দেবী খড়্গ দিয়া যেই তাহার শুঁড় কাটিলেন, অমনি হাতি আবার মহিষ হইয়া গেল, সেটা আবার শিং দিয়া দেবীকে পর্বত ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। দেবী এক লাফে সেই মহিষের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাকে এমনি ঘা মারিলেন যে তখন অসুর মহাশয়কে সেই মহিষের ভিতর হইতে বাহির হইতেই হইল। কিন্তু তখনও তাহার তেজ কমে নাই, সে আধাআধি বাহির হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

যাহা হউক, যুদ্ধ আর বেশিক্ষণ করিতে হইল না। কেন না দেবী সেই মুহূর্তেই খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

তখন তো দেবতাগণের খুব আনন্দ হইবেই। তাঁহারা দেবীকে প্রণাম করিয়া অনেক স্তব-স্তুতি করিলেন।

দেবী তাহাতে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমরা কী বর চাও?' দেবগণ বলিলেন, 'আবার কী বর চাহিব? মহিষাসুর মরিয়াছে, তাহাতেই আমাদের ঢের হইয়াছে। এখন শুধু এইটুকু বলুন যে, আমাদের আবার যদি বিপদ হয় তখন ডাকিলে আসিবেন!'

দেবী বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি আসিব।'

এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

অসুর যতদিন আছে, ততদিন দেবতাদিগের বিপদের আর অভাব কী?

কাজেই বুঝিতে পার যে দেবীর শীঘ্র আবার তাঁহাদের ডাকে আসিতে হইয়াছিল।

শুম্ভ-নিশুম্ভ

শুম্ভ আর তাহার ভাই নিশুম্ভ, এই দুটো অসুর দেবতাদিগকে বড়ই নাকাল করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া আর অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই, তাঁহাদের ব্যবসায় পর্যন্ত নিজেরা করিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্র, সূর্য, কুবের, পবন, অগ্নি কাহারও ব্যবসাই তাঁহাদের হাতে রাখিল না।

বিপাকে পড়িয়া দেবতরা বলিলেন, 'আর কাহার কাছে যাইব! মহিষাসুরের হাত হইতে যে দেবী আমাদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন সেই চণ্ডিকা দেবীকেই ডাকি।' এই বলিয়া তাঁহারা হিমালয় পর্বতে গিয়া চণ্ডিকা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময় পার্বতী সেই পথে যাইতেছিলেন, তিনি দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?' তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার শরীর হইতে চণ্ডিকা দেবী বাহির হইয়া বলিলেন, 'দেবতারা আমাকেই ডাকিতেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।' এই বলিয়া চণ্ডিকা দেবী যারপরনাই সুন্দর একটি মেয়ে সাজিয়া হিমালয় পর্বতে বসিয়া রহিলেন।

চণ্ড আর মুণ্ড নামে দুইটি অসুর সেইখানে কি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়া শুম্ভকে গিয়া বলিল যে, 'মহারাজ, হিমালয় পর্বতে কী আশ্চর্য সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখিয়া আসিয়াছি, কী বলিব! এমন আর কেহ কখনো দেখে নাই। মহারাজ, সংসারের যত ভাল ভাল জিনিস সব আপনারা আনিয়াছেন, কিন্তু এই মেয়েটিকে রানী করিতে না পারিলে সবই মাটি।'

একথা শুনিয়া শুম্ভ তখনই সুগ্রীব নামে একটা অসুরকে ডাকিয়া বলিল, 'সুগ্রীব, শীঘ্র যাও। যেমন করিয়া পার সেই মেয়েটিকে খুশি করিয়া এখানে লইয়া আইস।'

সুগ্রীব হিমালয়ে গিয়া দেবীকে বিশেষ করিয়া বুঝইতে লাগিল, 'আবার প্রভু যে শুম্ভ আর নিশুম্ভ তাঁহাদের মতন আর জগৎ সংসারে কেহই নাই। হে দেবী, ইঁহাদের একজনকে বিবাহ করিলে তোমার আর সুখের সীমা থাকিবে না!'

দেবী বলিলেন, 'আহা! তুমি বড় ভাল কথা বলিয়াছ, তোমার যে প্রভু, তাহাদের মতন আর কোথাও কেহ নাই। কিন্তু আমার ছেলেমানুষী খেয়াল হইয়াছে, আমাকে যুদ্ধে হারাইতে না পারিলে কেহ আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। তোমার প্রভুকে গিয়া বল শীঘ্র আসিয়া আমাকে যুদ্ধে হারাইয়া বিবাহ করুন।'

এ কথা শুনিয়া শুম্ভ কী ভয়ানক চটিল, বুঝিতেই পার। সে অমনি তাহার সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলিল, 'যাও তো ধূম্রলোচন, সেই ঠেঁটা মেয়েটাকে চুলে ধরিয়া নিয়া আইস!' ধূম্রলোচন অনেক লোক লইয়া ভারি ঘটা করিয়া দেবীকে আনিতে গেল। কিন্তু সে তাঁহাকে ধরিয়া আনিবে কি, তিনি কেবল একটিবার

হুং করিয়া তাহার দিকে চাহিবামাত্রই পুড়িয়া ছাই। তাহার সঙ্গে আর যত অসুর আসিয়াছিল, দেবীর সিংহই তাহাদিগকে শেষ করিয়া দিল।

তখন শুম্ভ আরো অনেক সৈন্য, রথ, হাতি, ঘোড়া সঙ্গে দিয়া সেই চণ্ড আর মুণ্ডকে পাঠাইল। তাহারা খাঁড়া ঢাল হাতে হিমালয়ে গিয়া বিষম কাই-মাই শব্দে যেই দেবীকে ধরিতে যাইবে, অমনি দেবী ভ্রূকুটি করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন। ভ্রূকুটি করিবামাত্র তাঁহার কপাল হইতে আর একটি দেবতা বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার নাম চামুণ্ডা। তাঁহার চেহারা বড়ই ভয়ঙ্কর। রং কালো, চোখ লাল, শরীরে মাংস নাই, খালি হাড় আর চামড়া। হাঁ করিলে পাহাড় পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিতে পারেন, চ্যাঁচাইলে দেব দানব সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। চামুণ্ডা গদা খড়্গ পাশ হাতে আসিয়াই অসুরদিগকে ধরিয়া মুড়ি-মুড়কির মত মুখে পুরিতে লাগিলেন। হাতি, রথ, ঘোড়া, মাহুত, সারথি, অঙ্কুশ, জাঠা, গদা, যাহা হাতে উঠে, মনের সুখে চিবাইয়া খান,—বাছিবার দরকার হয় না। অসুরদের যত অস্ত্র আসে, সব গিলিয়া ফেলেন আর হি হি হি করিয়া হাসেন। দেখিতে দেখিতে চামুণ্ডা সকল অসুর খাইয়া শেষ করিলেন। বাকি রহিল কেবল চণ্ড আর মুণ্ড। তাহাদের চুল ধরিয়া মাথা কাটিতেও মুহূর্তেক মাত্র লাগিল।

ইহার পর শুম্ভ আর নিশুম্ভ যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহাদের সঙ্গে অতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অসুর যে কত আসিল, আর হাতি, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র যে কত রকম আসিল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। আর যুদ্ধ যাহা হইল, তাহার কথা কী বলিব! দেবীর সঙ্গে চামুণ্ডা আছেন, আর অন্য দেবতারাও নানা রকমে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন, আর দেবীর সিংহ তো আছেই। সে সময়ে দেবী এমন বিকট হাসি হাসিতেছেন যে অনেক অসুর তাহাতেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তখন চামুণ্ডার মতন দেবী নিজেও তাহাদিগকে ধরিয়া মুখে দিতেছিলেন। ইহার পর আর টিকিতে না পারিয়া অসুরেরা ছুটিয়া পালাইতে লাগিল।

অসুরদের মধ্যে একজন ছিল, তাহার নাম রক্তবীজ। সে বেটা বড়ই ভয়ঙ্কর; তাহার একবিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলেই সেখান হইতে একটা বিশাল অসুর দাঁত খিঁচাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। সেই রক্তবীজকে লইয়া দেবী প্রথমে একটু মুশকিলে পড়িলেন। তাহাকে যত কাটেন ততই রক্ত পড়ে, আর ততই হাজার হাজার অসুর উঠিয়া দাঁড়ায়। অসুরে অসুরে ত্রিভুবন ছাইয়া গেল, তাহাদের চিৎকারে পাতালের লোক অবধি কালা হইয়া গেল। দেবতারা তো ভাবিলেন, সর্বনাশ বুঝি হয়!

তখন দেবী চামুণ্ডাকে বলিলেন, 'এক কাজ কর। অসুরের গায়ে খোঁচা লাগিতে না লাগিতেই তাহার রক্ত চাটিয়া খাইবে আর সেই রক্ত হইতে অসুর হইতে না হইতেই তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে।' চামুণ্ডা বলিলেন, 'আচ্ছা।' ইহার পর আর রক্তবীজের বেশি বাড়াবাড়ি করিতে হয় নাই। গিলিয়া খাইলে আর অসুর হইয়াই বা কী করিবে? কাজেই দেখিতে দেখিতে অসুরের দল কমিয়া গেল, রক্ত-বীজের গায়ের রক্ত ফুরাইয়া আসিল। এতক্ষণ সে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু

রক্ত ফুরাইয়া গেলে আর তাহার কিছু করিবার শক্তি রহিল না। দেখিতে দেখিতে দেবী নানা অস্ত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

তখন বাকি রহিল শুম্ভ আর নিশুম্ভ। নিশুম্ভ খানিকক্ষণ খুব যুদ্ধ করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। তারপর শুম্ভ একাই যুদ্ধ করিতে লাগিল। শুম্ভের আটটা হাত ছিল, গায় জোরও ছিল তেমনি; সে যুদ্ধও করিল খুব। কিন্তু শেষে সেও অজ্ঞান হইয়া গেল।

ততক্ষণে নিশুম্ভের আবার জ্ঞান হইয়াছে। নিশুম্ভের দশ হাজার হাত। সেই দশ হাজার হাতে দশ হাজার অস্ত্র লইয়া সে দেবীর সঙ্গে বিষম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মরিবার সময়ও সে সহজে মরিল না। দেবী শূল দিয়া তাহার বুক ভেদ করিয়া ফেলিলেন, সেই বুকের ভিতর হইতে আবার 'দাঁড়া', 'দাঁড়া' বলিয়া একটা বিকট অসুর বাহির হইয়া আসিল। যাহা হউক, সে ভাল করিয়া বাহির হইতে না হইতেই দেবী হাসিতে হাসিতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলাতে, বেচারা যুদ্ধ করিবার অবসর পায় নাই।

শুম্ভ ইহার মধ্যেই আবার উঠিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাই তাহার শেষ যুদ্ধ। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিধিমতে দেবীকে মারিবার চেষ্টা করিল। একটি একটি করিয়া তাহার সকল অস্ত্রই দেবী কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর বাকী রহিল খালি কীল আর চাপড়। একবার দেবীর চড় খাইয়া সে চিত হইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু তখনই আবার উঠিয়া দেবীকে ধরিরা এক লাফে আকাশে উঠিয়া গেল। তার-পর আকাশে থাকিয়াই দুজনে কম যুদ্ধ হইল না। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবী তাহাকে বন্-বন্ করিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন, তাহাতেও সে কি মরে? সে তখনই উঠিয়া কীল বাগাইয়া দেবীকে মারিেত চলিল। তখন দেবী তাঁহার শূল দিয়া তাহার বুকে এমনি ঘা মারিলেন যে তাহাকে আর উঠিতে হইল না।

তখন যে দেবতারা দেবীর স্তব খুব ভাল করিয়াই করিয়াছিলেন, তাহা আমি না বলিলেও তোমরা বুঝিয়া লইতে পারিবে। দেবী তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমরা কী চাও?' দেবতারা বলিলেন, 'এমনি করিয়া আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিও।'

ত্রিপুর

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল। দিনরাতই কেবল ইহাদের মারামারি চলিত, তাহাতে অনেক সময় অসুররাও হারিত, অনেক সময় দেবতারাও হারিতেন। দেবতারা অসুরদের জ্বালায় অস্থির থাকিতেন; আবার অসুরেরা তপস্যা করিলে তাহাদিগকে বর না দিয়াও পারিতেন না। বর দিয়া তারপর তাহার ধাক্কা সামলাইতে তাহাদের প্রাণান্ত হইত।

একটা অসুর ছিল, তাহার নাম ময়। জাদু, মায়া, ভেলকিবাজি যত আছে ময় তাহার সকলই জানিত, আর তাহার জোরে সময় সময় দেবতাদিগকে সে ভারি নাকাল করিত।

একবার যুদ্ধে হারিয়া ময় তপস্যা করিতে লাগিল। বিদ্যুন্মালী আর তারক নামে আর দুই অসুরও তাহার দেখাদেখি তপস্যা আরম্ভ করিল। তাহারা উপবাস করিয়া, শীতে ভুগিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এমনি তপস্যা করিল যে, ব্রহ্মা আর তাহাদের কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মা বলিলেন, 'বাপুসকল, আমি তোমাদের তপস্যায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, এখন কী বর লইবে বল?'

তখন ময় জোড় হাতে মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিল, 'প্রভু, দেবতারা আমাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন আমরা কোথাও একটু থাকিবার জায়গা পাইতেছি না। দয়া করিয়া আমাকে এমন বর দিন, যাহাতে আমি একটি খুব ভাল দুর্গ প্রস্তুত করিতে পারি। সে দুর্গের ভিতরে বসিয়া থাকিলে আর কেহই যেন আমাকে কিছু করিতে না পারে।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'একেবারে কেহই কিছু করিতে পারিবে না, এমন কি হয়?'

ময় বলিল, 'তাহা যদি না হয় তবে এই বর দিন যে, একমাত্র শিব ছাড়া আর কেহ সে দুর্গ নষ্ট করিতে পারিবে না, আর শিবকেও একটি মাত্র বাণ মারিয়া সে কাজ করিতে হইবে।'

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, 'আচ্ছা তাই হইবে।' এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, ময়ও খুবই খুশি হইয়া দুর্গ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

ময় বলিল, 'আমি এমন দুর্গ বানাইব যে, তাহা তিন ভাগ হইয়া তিন জায়গায় থাকিবে। তাহা হইলে আর এক বাণে তাহাকে নষ্ট করা যাইবে না। খালি একদিন সেই তিনটি ভাগ একত্র হইবে—যেদিন চন্দ্র আর সূর্য একসঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রে থাকিবেন সেইদিন যদি শিব আসিয়া বাণ মারেন, তবেই আমার এই দুর্গ তিনি নষ্ট করিতে পারিবেন, নহিলে নয়।'

এমনি করিয়াই সে তাহার সেই দুর্গ প্রস্তুত করিল। পৃথিবীর উপরে করিল একটি লোহার দুর্গ; সেটা তারকের জন্য। স্বর্গে করিল একটা রুপার দুর্গ; সেটা বিদ্যুন্মালীর জন্য আর স্বর্গেরও উপরে একটা সোনার দুর্গ; সেটা তাহার নিজের জন্য। এইরূপে তিনটি পুরী মিলিয়া দুর্গটি প্রস্তুত করা হইল, তাই তাহার নাম হইল ত্রিপুর।

তেমন দুর্গ কেহ আর কখনও দেখে নাই। যেমন বড়, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর। মাঠ, বাগান, পথ-ঘাট, হাট-বাজার, নদী পুকুর সকলই তাহার ভিতর আছে, কোন জিনিসের জন্যই দুর্গের বাহিরে যাইতে হয় না। অসুরেরা যে যেখানে ছিল, খবর পাইয়া সকলে আসিয়া সেই দুর্গে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আর তাহাদের কিসের ভয়?

তখন তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। এতদিন দেবতাদের ভয়ে ঝোপে-জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল, এখন আবার সুবিধা পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করিল। কোনদিন স্বর্গের বাগান ভাঙে, কোনদিন দেবতাদের বাড়ি গিয়া ঝগড়া করে, কোনদিন মুনি-ঋষিদের তপস্যা মাটি করিয়া দেয়।

ময় নিজে তেমন মন্দ লোক ছিল না, কিন্তু অসুরেরা তাহার কথা শুনিলে তো! তাহারা দল বাঁধিয়া সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া মারে; তাহাদের ভয়ে লোক স্থির হইয়া ঘরে থাকিতে পারে না।

তখন সকলে ব্রহ্মার নিকট গিয়া জোড় হাতে বলিল, 'হে পিতামহ! আপনি তো অসুরদিগকে বর দিয়াছেন; এখন আমাদের কী উপায় হইবে? অসুরের জ্বালায় আমাদের প্রাণে বাঁচাই যে ভার হইয়াছে! আপনি যদি তাহাদের শাসন না করেন, তবে আর সংসারে দেবতা মানুষ বা জীবজন্তু কিছুই থাকিবে না।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি বর দিয়াছি বটে, কিন্তু উপায়ও রাখিয়া দিয়াছি। ইহাদের ঐ দুর্গ একটি বাণেই ভাঙিয়া ফেলা যায়, কিন্তু তাহা তোমরা পারিবে না; চল শিবের কাছে যাই। তিনিই এ কাজে উপযুক্ত লোক।'

শিব তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় তেত্রিশ কোটি দেবতা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জোড় হাতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

শিব বলিলেন, 'তোমরা কী জন্য আসিয়াছ? বল আমি তোমাদের কী উপকার করিতে পারি, এখনি তাহা করিব।'

দেবতারা বলিলেন, 'অসুরেরা তো আর আমাদের কিছু রাখিল না, এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমাদের বাড়ি বাগান সব ভাঙিয়া দিয়াছে, হাতি-ঘোড়া ধরিয়া নিয়াছে, ধনরত্ন লুট করিয়াছে, এরপর প্রাণে মারিবে। দোহাই ঠাকুর! আমাদের রক্ষা করুন!'

তাহা শুনিয়া শিব বলিলেন, 'তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি ত্রিপুর দুর্গ পোড়াইয়া দিতেছি! একখানা ভালোরকম রথ আন তো!'

এ কথায় দেবতারা সকলে মিলিয়া সংসারের সকল ভয়ঙ্কর আশ্চর্য জিনিস দিয়া এমনি চমৎকার এক রথ প্রস্তুত করিলেন সে কী বলিব! রথের দিকে চাহিয়া শিব অনেকক্ষণ ধরিয়া খালি 'বাঃ! বাঃ!' এইরূপই করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, 'বেশ রথ হইয়াছে। এখন ইহার উপযুক্ত একটি সারথি চাই।'

দেবতারা তো বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। এমন রথের সারথি তো যেমন-তেমন কেহ হইলে চলিবে না,—হায়, এখন সারথি কোথায় পাই?

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, 'চিন্তা কী? আমিই সারথি হইব।' এই বলিয়া ব্রহ্মা যখন রথে উঠিয়া রাশ ধরিয়া বসিলেন তখন সকলের কী আনন্দই হইল! শিবও তখন খুব সুখী হইয়া বলিলেন, 'এইবার ঠিক সারথি হইয়াছে।'

সেই রথে চড়িয়া শিব যুদ্ধ করিতে চলিলেন, সঙ্গে দেবতা গন্ধর্ব সকলে জয় জয় শব্দে ছুটিয়া চলিল। ষাঁড়ে চড়িয়া নন্দী চলিল, ময়ূরে চড়িয়া কার্তিক চলিলেন,

ঐরাবতে চড়িয়া ইন্দ্র চলিলেন, সাপে চড়িয়া বরুণ চলিলেন, মহিষে চড়িয়া যম চলিলেন। শিবের যত ভূত তাহারাও শিবের রথ ঘিরিয়া গর্জন করিতে করিতে চলিল,—হাতির মত, পাহাড়ের মত তাহাদের শরীর, মেঘের মত তাহাদের ডাক।

এদিকে অসুরেরা এ-সকল দেখিয়া শুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ময় তাড়াতাড়ি অসুরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সাবধান, সাবধান! ঐ দেখ দেবতারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। দেখিও, যেন উহাদিগকে সহজে ছাড়িও না।'

এমনি করিয়া ক্রমে দেবতা আর অসুরদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরগুলি দেখিতে যেমন ভয়ঙ্কর, শিবের ভূতসকলও তেমনি বিকট; আর তাহাদের যুদ্ধও হইল বড় সাংঘাতিক। অসুরেরা মনে করে যে তাহারা দেখিতে ভারি সুন্দর, তাই ভূতগুলির জানোয়ারের মত মুখ দেখিয়া তাহারা হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না।

সেই ভূতদের সঙ্গে খানিক যুদ্ধ করিলেই আবার তাহাদের সে হাসি শুকাইয়া যায়। তবুও অসুরেরা যেমন-তেমন যুদ্ধ করে নাই! ময় আর তারক দুজনে নানারূপ মায়া খেলাইয়া ভূত আর দেবতা সকলকেই অত্যন্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোথা হইতে যে তাহারা যত রাজ্যের আগুন, বৃষ্টি, সাপ, কুমির আনিয়া দেবতাদের উপর ফেলিতে লাগিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। তথাপি ক্রমে দেবতাদেরই জয় হইতে লাগিল। নন্দীর হাতে বিদ্যুন্মালী মারা গেল, আর সকল অসুরই কাবু হইয়া পড়িল। তখন ময় দেখিল যে এখন একবার দুর্গের ভিতরে গিয়া একটু বিশ্রাম না করিলে আর চলিতেছে না।

দুর্গের ভিতরে আসিয়া ময় ভাবিতেছে, এখন উপায় কী হয়? এমন দুর্গ করিয়াও দেবতাদের হাতে শেষে নাকাল হইতে হইল! বলিতে বলিতে চট করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি যোগাইয়াছে, আর অমনি সে মায়ার বলে দুর্গের ভিতরে এক আশ্চর্য পুকুর তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছে। সে পুকুরের জল অমৃত, সে জল একবার খাইলে বা স্নান করিলে মড়া যে সেও বাঁচিয়া উঠে।

তখন আর কিসের ভয়? যত অসুর মরে, সকলকেই আনিয়া সেই পুকুরে স্নান করায়। এমনি করিয়া তাহারা বিদ্যুন্মালীকে আবার বাঁচাইয়া তুলিল, আরও কত অসুর যে বাঁচাইল তাহার তো সীমা সংখ্যাই নাই। বাঁচিয়া উঠিয়াই তাহারা আবার বলিল, 'কোথায় গেল শিব? কোথায় নন্দী? কোথায় দেবতা? কোথায় ভূত? মার তাহাদের সকলকে!'

এবারে দেবতারা বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। যত অসুর মরে, সকলেই খানিক পরে আবার আসিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! মরিয়াও মরে না, বরং তাহাদের গায়ের জোর যেন আরো বাড়িয়া যায়। দেবতাগণ আর ভাবিয়া পথ পাইতেছে না।

এমন সময় শিবের একটা ভূত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'কর্তা, অসুর মারিয়া আর কী হইবে? এদের ঘরে পুকুর আছে, তাহার জলে ডুবাইলে মরাটি চাঙা হয়।'

অসুরেরা তখন বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল। দেবতারা একে ইহাদের জ্বালায় অস্থির, তাহাতে আবার শিবের রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গিয়াছে, সকলে প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারিতেছেন না। তখন যদি বিষ্ণু তাড়াতাড়ি এক বিশাল ষাঁড় সাজিয়া শিং দিয়া সেই রথ না উঠাইতেন, তবে না জানি সেদিন কী সর্বনাশই হইত! ইহাদের মধ্যে তারকাসুর ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে এমন গুঁতা মারিয়াছিল যে, তিনি হাতের রাশ রথে ফেলিয়া কেবলই হাঁপাইতে ছিলেন।

এদিকে বিষ্ণু রথখানিকে শিং দিয়া উঠাইয়া দিয়াই অসুরদিগের দুর্গের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। অসুরেরা তাহার বিশাল দেহ আর শিং নাড়া দেখিয়া আর গর্জন শুনিয়া আর তাঁহাকে আটকাইতে সাহসই পাইল না। তিনি ছুটিতে ছুটিতে সেই পুকুরে গিয়া চোঁ-চোঁ শব্দে সমস্ত জল খাইয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আর অসুরেরা ভূতদের সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না; তাহারা ঢিপঢাপ ভূতের কীল খাইতে খাইতে ছুটিয়া দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সকলে হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কোথায় শিব? কোথায় দেবতা? কোথায় ভূত? মার সকলকে!'

তখন আর অসুরেরা ভূতের ভয়ে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের দুর্গসুদ্ধ সমুদ্রের উপর চলিয়া গেল। কিন্তু দেবতারা তাহাদিগকে এত সহজে ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সেইখানে গিয়া আবার তাহাদের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তারকাসুর নন্দীর হাতে মারা গেল, বিদ্যুন্মালীরও সেই দশা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

তারপর ক্রমে সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন চন্দ্র আর সূর্য একসঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রে আসিবেন। সেই পুষ্যা যোগে ত্রিপুর দুর্গের তিনটি ভাগও এক জায়গায় আসিয়া মিলিবার কথা। তখন তাহার উপরে শিবের বাণ পড়িলে, এক বাণেই সেই দুর্গ নষ্ট হইয়া যাইবে। শিব তাহার জন্যই ধনুর্বাণ লইয়া প্রস্তুত আছেন। ঠিক সময়টি উপস্থিত হইবামাত্র ভীষণ শব্দে তিনি সেই বাণ ছাড়িয়া দিলেন, অমনি তাহা আকাশ পাতাল আলো করিয়া অসুরদিগের দুর্গের উপর গিয়া পড়িল। সে বাণের তেজ এমনি ছিল যে দুর্গের উপর তাহা পড়িবামাত্রই দেখিতে দেখিতে সেই দুর্গ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

এইরূপে ত্রিপুর দুর্গের শেষ হইল। অসুরেরা আর সকলেই তাহার সঙ্গে পুড়িয়া মরিয়াছিল, কেবল ময় মরে নাই। সে শিবের ভক্ত ছিল, তাই শিব দয়া করিয়া নন্দীকে পাঠাইয়া আগেই তাহাকে সাবধান করিয়া দেন। নন্দীর কথায় সে তাহার থাকিবার ঘরখানি সুদ্ধ লইয়া পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল!

পিপ্পলাদ

দধীচি মুনির নাম হয়ত তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। তাঁহার মতন তপস্যা অতি অল্প লোকেই করিয়াছে। মহর্ষি দধীচি অতিশয় শান্ত আর পরম দয়ালু ছিলেন। গঙ্গার ধারে নিজের আশ্রমে থাকিয়া পত্নী প্রাতিথেয়ীকে লইয়া ভগবানের নাম করা, গাছপালার প্রতি যত্ন, সকল জীবে দয়া আর অতিথি আসিলে তাহার সেবা করা, এ সকল ছাড়া তাঁহার আর কাজ ছিল না। কিন্তু এই নিরীহ লোকটির তপস্যার এমনি তেজ ছিল যে, তাহার ভয়ে অসুরেরা তাহার আশ্রমের কাছে আসিতেই থর থর করিয়া কাঁপিত। অথচ দেবতাদিগকে সেই অসুরেরা জ্বালাতনের একশেষ করিত। কতকাল ধরিয়া যে ইহাদের যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহার ঠিকানাই নাই। সেই যুদ্ধে কখনও দেবতারা জিতিতেন, কখনও বা অসুরদিগের নিকট হারিয়া বিধিমত নাকাল হইতেন। যাহা হউক, একবার দেবতারা নানা রকমের আশ্চর্য অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অসুরদিগকে হারাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহাদের এই চিন্তা হইল যে, এই সকল অস্ত্রের কাজ তো ফুরাইল, এখন এইগুলিকে কোথায় রাখা যায়? যুদ্ধ করিয়া শরীর অত্যন্ত কাহিল হইয়াছে, এইগুলিকে আর স্বর্গে বহিয়া লইবার শক্তি নাই, সেখানে লইয়া গেলেও হয়ত আবার কোনদিন অসুরেরা আসিয়া কাড়িয়া লইবে।

শেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহারা দধীচির নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আমাদের এই অস্ত্রগুলি যদি দয়া করিয়া আপনার নিকট রাখেন, তবে আমাদের বড় উপকার হয়। আপনার কাছে থাকিলে আর দৈত্যরা এইগুলি চুরি করিতে পারিবে না।' এই কথায় দধীচি সবে বলিয়াছেন 'যে আজ্ঞা', অমনি প্রাতিথেয়ী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'ওগো, তুমি এই ফ্যাসাদের ভিতর যাইও না। দেবতা মহাশয়েরা এখন মিষ্ট কথা কহিতেছেন, কিন্তু আমাদের এখানে থাকিয়া যদি জিনিসগুলি নষ্ট হয় বা চুরি যায় তখন ইঁহারা বড়ই চটিবেন।' দধীচি বলিলেন, 'তাই তো, এখন আর কী করা যায়? "যে আজ্ঞা" বলিয়া ফেলিয়াছি, এখন তো আর "না" বলা যাইতে পারে না।'

সুতরাং অস্ত্রগুলি দধীচির আশ্রমেই রহিল, আর দেবতারা তাহাতে যারপরনাই তুষ্ট হইয়া নিজের নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। তারপর এক বৎসর যায় দু বৎসর যায়, ক্রমে সাড়ে তিন লাখ বৎসর কাটিয়া গেল, তবুও দেবতাদের আর কোন খোঁজ-খবর নাই। ততদিনে অস্ত্রে মরিচা তো ধরিয়াছেই, তাহা ছাড়া অসুরদের আবার বেজায় তেজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দিনরাত কেবল ওই অস্ত্রগুলির উপর তাহাদের চোখ; না জানি কোন ফাঁকে সেগুলিকে লইয়া যাইবে। তখন দধীচি ভাবিলেন যে, দেবতারা তো আসিলেনই না, এখন অস্ত্রগুলি যাহাতে অসুরদের হাতে না পড়ে,

তাহার উপায় দেখিতে হয়।

সে বড় আশ্চর্য উপায়। জলে মন্ত্র পড়িয়া অস্ত্রগুলিতে ধুইবামাত্র তাহাদের সকল তেজ সেই জলে গুলিয়া গেল। সে জল দধীচি তখনই খাইয়া ফেলিলেন, কাজেই আর কোন চিন্তার কারণই রহিল না। তারপর দেখিতে দেখিতে অস্ত্রগুলি আপনা হইতেই ক্ষয় হইয়া গেল, তখন অসুরেরা আর কি লইবে?

দধীচি সবে এই কাজটি করিয়া একটু নিশ্চিত হইয়াছেন, আর ঠিক সেই সময়ে দেবতাদের অস্ত্রগুলির কথা মনে পড়িয়াছে। এতদিন বাদে, এত কাণ্ডকারখানার পর তাঁহারা আসিয়া দধীচিকে বলিলেন, 'ঠাকুর, অসুরেরা তো আবার ভারি মুশকিল বাধাইয়াছে। শীঘ্র আমাদের অস্ত্রগুলি দিন।'

দধীচি বলিলেন, 'তাই তো, আপনারা এতদিন আসেই নাই, তাই আমি দৈত্যদের ভয়ে সেগুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন কি করি বলুন?'

তাহা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, 'আমরা আর কী বলিব? আমরা বলি আমাদের অস্ত্রগুলি দিন। অস্ত্র না পাইলে আর আমাদের বিপদের সীমাই থাকিবে না।'

দধীচি বলিলেন, 'সে সকল অস্ত্র তো এখন আমার হাড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আপনারা না-হয় সেই হাড়গুলি নিন!'

দেবতারা বলিলেন, 'আমাদের অস্ত্রেরই দরকার, আপনার হাড় লইয়া কি করিব?'

দধীচি বলিলেন, 'আমার হাড় দিয়া অতি উত্তম অস্ত্র প্রস্তুত হইবে। আমি এখনই দেহত্যাগ করিতেছি।'

তখন দেবতারা আর কী করেন? তাঁহারা বলিলেন, 'আচ্ছা তবে একটু শীঘ্র শীঘ্র তাহাই করুন।'

দেবী প্রাতিথেয়ী তখন ঘরে ছিলেন না, স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দেবতারা সেই বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী মেয়েকে বড়ই ভয় করিতেন, তাই তাঁহারা ভাবিলেন যে তিনি ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই কাজ শেষ করিতে হইবে। দধীচি যোগাসনে বসিয়া একমনে ভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে পবিত্র আত্মা তাঁহার দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন দেবতারা বিশ্বকর্মাকে বলিলেন, 'এখন তুমি ইহার হাড় দিয়া অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার কর।'

বিশ্বকর্মা বলিলেন, 'আমি কী করিয়া অস্ত্র তৈয়ারী করিব? ইঁহার দেহ কাটিলে তবে তো হাড় পাওয়া যাইবে। বাপ রে! সে কাজ আমার দ্বারা হইবে না! হাড়গুলি পাইলে আমি এখনই তাহা দিয়া অস্ত্র গড়িয়া দিতে পারি।'

তখন দেবতাদের কথায় গরুর দল আসিয়া গুঁতাইয়া মুনির দেহ হইতে হাড় বাহির করিয়া দিল, দেবতারাও মহানন্দে তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন। সেই হাড় দিয়া বিশ্বকর্মা শেষে বজ্র প্রভৃতি নানারূপ আশ্চর্য অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এদিকে প্রাতিথেয়ী স্নান আহ্নিকের পর কলসী হাতে আশ্রমে ফিরিয়া দেখেন,

মহর্ষি নাই, তাঁহার লোম আর চামড়া মাত্র পড়িয়া আছে। ঘরে অগ্নি ছিলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেবী সকল কথাই জানিতে পারিলেন। সেই দারুণ সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার চেতনা হরণ করিয়া লইল, তাঁহার দেহ লুটাইয়া পড়িল। জ্ঞান হইলে পর অনেক কষ্টে শোক সম্বরণপূর্বক তিনি দধীচির দেহের অবশিষ্টটুকু লইয়া আগুনে ঝাঁপ দিলেন। যাইবার সময় নিজের নিতান্ত শিশুপুত্রটিকে গঙ্গার নিকটে আর গাছপালার নিকটে সঁপিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, 'এই পিতৃমাতৃহীন শিশুটিকে তোমরা দয়া করিয়া দেখিবে।'

দধীচিও গেলেন, প্রাতিথেয়ীও গেলেন। আশ্রম অন্ধকার হইল। তপোবনের পশুপক্ষী আর বৃক্ষলতারা তখন কাঁদিয়া বলিল, 'হায়! যাঁহারা আমার পিতা-মাতার মতন ছিলেন, তাঁহাদের দুজনকেই হারাইলাম। আমাদের কী দুর্ভাগ্য! আর তো আমরা তাঁহাদের সেই পবিত্র মুখ দেখিতে পাইব না! এখন তাঁহাদের এই শিশুটিকে দেখিয়াই আমাদের মন শান্ত থাকিবে।'

এখন হইতে এই শিশুটিকে পালন করাই হইল তাহাদের একমাত্র কাজ। চন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত চাহিয়া আনিয়া তাহারা শিশুটিকে খাইতে দিল, সেই অমৃতের গুণে শিশু দেখিতে দেখিতে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বাড়িয়া উঠিল। পিপুল (অশ্বত্থ) গাছেরা তাহার বড়ই যত্ন করিয়াছিল, তাই তাহার নাম পিপ্পলাদ।

পিপ্পলাদ জানিত, সে সেইসকল গাছপালারই ছানা। তারপর যখন তাহার বুদ্ধি একটু বাড়িয়াছে, তখন সে একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, গাছের ছানা তো গাছের মতই হয়, মানুষের ছানা মানুষের মত হয়, পাখির ছানা হয় পাখির মত, আবার জন্তুর ছানা জন্তুর মত। কিন্তু আমি যে তোমাদের ছানা, আমার এমন হাত-পা হইল কী করিয়া?'

গাছেরা বলিল, 'বাছা, তুমি তো আমাদের ছানা নও! তুমি মুনির পুত্র; তোমার পিতা মহর্ষি দধীচি, মাতা দেবী প্রাতিথেয়ী।'

পিপ্পলাদ বলিল, 'আমার বাবা আর মা তবে কোথায় গেলেন?' গাছেরা বলিল, 'তোমার পিতা দেবতাদের উপকারের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তোমার মাতা সেই দুঃখে আগুনে ঝাঁপ দিয়াছেন।'

এমনি করিয়া গাছেরা সকল কথাই পিপ্পলাদকে বলিল। তাহা শুনিয়া সে আগে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিল, তারপর গাছেদের মিষ্ট কথায় একটু শান্ত হইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে আমি মারিব!'

তখন গাছেরা সেই ছেলেটিকে চন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া সকল কথা বলিল।

তাহা শুনিয়া চন্দ্র বলিলেন, 'বৎস পিপ্পলাদ! বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, রূপ, গুণ, সুখ, মান, যশ, পুণ্য সকলই আমি তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।'

পিপ্পলাদ বলিল, 'আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে; তাহাদিগকে যদি না মারিতে পারিলাম, তবে এসব লইয়া আমার কী হইবে? আগে বলুন, কোথায়,

কোন্ দেশে, কোন্ তীর্থে গিয়া, কী মন্ত্র বলিয়া, কোন্ দেবতাকে ডাকিয়া আমি এ কাজ করিতে পারিব ?'

চন্দ্র বলিলেন, 'শিবকে ডাক, তোমার কাজ হইবে।'

পিপ্পলাদ বলিল, 'আমি যে ছেলেমানুষ, আমি তো কিছুই জানি না, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিব ?'

চন্দ্র বলিলেন, 'চক্রেশ্বর তীর্থে গিয়া ভক্তিভরে তাঁহার কথা ভাব, আর তাঁহাকে ডাক, তবেই তিনি আসিবেন।'

পিপ্পলাদ তখনই সেই তীর্থে গিয়া প্রাণপণে শিবকে ডাকিতে লাগিল। সেই ডাকে শিব তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'পিপ্পলাদ, কি চাই ?'

পিপ্পলাদ বলিল, 'আমার দেবতুল্য ধার্মিক পিতামাতাকে যাহারা মারিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মারিতে পারি এমন ক্ষমতা আমাকে দিন।'

শিব কহিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার তিনটে চোখই দেখিতে পার, তাহা হইলে দেবতাদিগকে মারিতে পারিবে।'

কিন্তু পিপ্পলাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাঁহার দুইটা বই তিনটা চোখ দেখিতে পাইল না।

তখন শিব বলিলেন, 'আর কিছুদিন তপস্যা কর, দেখিতে পাইবে।'

এ-কথায় পিপ্পলাদ এমন ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিল যে অল্পদিনের ভিতরেই সে দেখিল, শিবের কপালে আর একটি চোখ আছে। তখন শিবের সেই চোখ হইতে আগুনের ঘোড়ার মতন একটা অতি ভয়ঙ্কর কৃত্যা (ভূত) বাহির হইয়া ঘোরতর শব্দে পিপ্পলাদকে বলিল, 'কি করিব ?'

পিপ্পলাদ বলিল, 'দেবতাদিগকে ধরিয়া খাও !'

বলিতে বলিতেই সেটা খপ করিয়া পিপ্পলাদকে ধরিয়া মুখে দিতে গিয়াছে।

'আরে, আরে, ও কী কর ?'

সেটা বলিল, 'দেবতাদিগকে খাইতে হইলে, তাহারা যে তোমার শরীর গড়িয়াছে, তাহাও খাইব।'

এ কথায় পিপ্পলাদ আবার শিবের স্তব করিলে, শিব সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে বলিলেন, 'এ স্থানের এক যোজনের মধ্যে তুমি কাহাকেও খাইতে পারিবে না।' তখন সেই ভূতটা সেখান হইতে দূরে গিয়া এমনই সর্বনেশে আগুন জ্বালাইয়া বসিল যে, আর একটু হইলেই সে দেবতার দলকে পোড়াইয়া শেষ করিত। দেবতারা প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শিবের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'রক্ষা করুন প্রভো ! আপনার ভূত আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিল। আপনি রক্ষা না করিলে এ-যাত্রা আর আমাদের উপায় নাই !'

শিব তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা এইখানে আসিয়া বাস কর, এখানে ওটা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না।'

দেবতারা বলিলেন, 'স্বর্গ আমাদের বাসস্থান, তাহা ছাড়িয়া এখানে কী করিয়া

থাকি ?'

শিব কহিলেন, 'তবে এক কাজ কর, সূর্যই হইতেছেন এই সংসারের পিতা। তিনি আসিয়া এখানে বাস করুন, তাহাতেই সকল দেবতার বাস করা হইবে।' এইরূপে তখনকার মত বিপদ কাটিয়া গেল।

তারপর শিবের উপদেশে পিপ্পলাদের রাগও দূর হইল। তখন শিব অনেকবার পিপ্পলাদকে বর লইতে বলিলেন। পিপ্পলাদ এমন সব বর প্রার্থনা করিল, যাহাতে জগতের উপকার হয়। নিজের জন্য সে কিছুই চাহিল না।

ইহাতে দেবতাগণ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, 'বাছা, তুমি তো তোমার নিজের জন্য কিছুই চাহিলে না। আমরা তোমাকে বর দিব, তুমি নিজের জন্য কিছু চাহিয়া লও।'

তখন পিপ্পলাদ জোড়হাতে দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমার পিতামাতার পবিত্র নাম কানে শুনিয়াছি মাত্র, তাঁহাদিগকে দেখিবার সুখ এই অভাগার ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহাতে আমার মন বড় অস্থির থাকে।'

দেবতারা বলিলেন, 'সেজন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না, এখনই তোমার পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে।'

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই পিপ্পলাদের পিতামাতা দিব্যবেশ পরিয়া, সোনার রথে চড়িয়া স্বর্গ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিপ্পলাদ অমনি তাঁহাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর একটিও কথা কহিতে পারিল না।

দধীচি ও প্রাতিথেয়ী তাহাকে অনেক আদর, অনেক আশীর্বাদ করিয়া, তাহার মনের সকল দুঃখ দূর করিয়া আবার স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এইভাবে সকল দিকেই সুখ হইল, এখন পিপ্পলাদের সেই ভয়ঙ্কর ভূতটা থামিলেই আর কোন কথা ছিল না।

দেবতারা বলিলেন, 'পিপ্পলাদ, তোমার এটাকে থামাও।'

পিপ্পলাদ বলিল, 'সাধ্য তো আমার নাই। আপনারা গিয়া উহাকে থামিতে বলুন; আমাকে দেখিলে আবার কী না করিতে চাহিবে।'

সে কথায় দেবতারা সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটার কাছে গিয়া তাহাকে থামিতে বলিলেন। সে তাহাকে খেঁকাইয়া বলিল, 'তাহা হইবে না! সকলকে খাইব, তবে তো থামিব। তাহার আগে আমার এ আগুন কিছুতেই নিভিবার নয়।' বাস্তবিক ইহাকে থামাইতে দেবতাদের বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল।

পৃথিবীর পিতা

সকলের আগে যাঁহাকে লোকে রাজা বলিয়াছিল, তাঁহার নাম ছিল পৃথু। তিনি সূর্যবংশের লোক ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল বেণ।

'রাজা' কি, না, যে রঞ্জন করে অর্থাৎ খুশি রাখে। পৃথু নানারকমে প্রজাদিগকে খুশি করিয়াছিলেন, তাই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'রাজা' নাম দিয়াছিল। পৃথুর পূর্বের লোকের দিন বড়ই কষ্টে যাইত। সেকালে গ্রাম নগর পথ-ঘাট কিছুই ছিল না। ঝোপে জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় সকলে বাস করিত। পৃথু তাহাদিগকে বাড়ি বাঁধিয়া এক জায়গায় থাকিতে শিখান, আর পথ বানাইয়া চলাফেরার সুবিধা করিয়া দেন। সেই হইতে শহর বস্তির সৃষ্টি হইল। সেকালের লোক চাষবাস করিতে জানিত না। ফলমূল খাইয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইত।

জমিতে কাঁকর, আকাশে মেঘ নাই, শুকনা মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া আছে, তাহাতে শস্য জন্মাইতে গেলেও তাহা হয় না। প্রজারা পৃথুকে বলিল, 'হে রাজা, পৃথিবী সকল শস্য খাইয়া বসিয়াছে, আমরা কেমন করিয়া বাঁচিব? ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইতেছি, আমাদিগকে শস্য আনিয়া দাও।'

পৃথু বলিলেন, 'বটে, পৃথিবীর এমন কাজ? শস্য সব খাইয়া বসিয়াছে? আচ্ছা এখনি ইহার সাজা দিতেছি। আন তো রে ধনুক, নিয়ে আয় তো তীর!'

পৃথিবী ভাবিল, 'মাগো, মারিয়াই ফেলে বুঝি!'

সে প্রাণের ভয়ে গাই সাজিয়া লেজ উঁচু করিয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। ব্রহ্মলোক অবধি ছুটিয়া গেল, কিছুতেই সে তাহাকে এড়াইতে পারিল না। তখন পৃথিবী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'দোহাই মহারাজ! আমি স্ত্রীলোক, আমাকে মারিলে আপনার পাপ হইবে।'

পৃথু বলিল, 'তুমি ভারী দুষ্ট। তোমাকে মারিলে অনেক উপকার হইবে! কাজেই ইহাতে পাপ নাই, পুণ্য আছে।'

পৃথিবী বলিল, 'প্রজাদের যে উপকার হইবে বলিতেছেন, আমি মরিলে তাহারা থাকিবে কোথায়?'

পৃথু বলিলেন, 'কেন? আমি তপস্যা করিয়া তাহাদের থাকিবার জায়গা করিব।'

পৃথিবী বলিল, 'আমাকে মারিলে শস্য পাওয়া যাইবে না; শস্য পাইবার উপায় আমি বলিতেছি। সে আর এখন শস্য নাই, আমার পেটে হজম হইয়া দুধ হইয়া গিয়াছে। আমাকে দোহাইলে সেই দুধ পাইতে পারেন। কিন্তু একটা বাছুর চাই, নহিলে দুধ বাহির হইবে না। আর জমির উঁচু নীচু দূর করিয়া দিন,

দুধ দাঁড়াইতে পারে, গড়াইয়া না চলিয়া যায়।’

রাজা তখনই ধনুকের আগা দিয়া জমির উপরকার ঢিপি সরাইয়া দিলেন। তাহাতে জমি সমান হইল, আর ঢিপিসকল এক-এক জায়গায় জড় হইয়া পর্বতের সৃষ্টি হইল। সমান জমির উপর লোকে ঘর বাড়ি বাঁধিল। সেই হইতেই গ্রাম নগরের সৃষ্টি। তাহার আগে এ-সব ছিল না।

জমি সমান হইল, এখন একটি বাছুর হইলেই গাই দোহাইয়া সেই জমির উপরে দুধ ছড়ানো যাইতে পারে। সেই বাছুর হইলেন স্বায়ম্ভব মনু। এমন বাছুর তো আর সহজে পাওয়া যায় না,—তাঁহাকে দেখিয়াই গাইয়ের বাঁট দিয়া দুধ ঝরিতে লাগিল।

তখন পৃথু নিজে হাতে গাই দোহাইতে লাগিলেন। সে আশ্চর্য গাই না জানি কতই দুধ দিয়াছিল! সংসারে যত শস্য, সকলই তাহাকে দোহাইয়া পাওয়া গেল, সেই শস্য খাইয়া এখনও আমরা বাঁচিয়া আছি। শুধু তাহাই নহে, পৃথুর পরে দেব, দানা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি আসিয়া সেই গাই দোহাইতে লাগিল। সকলেই নিজের নিজের বাসন আনিল। নিজেদের এক-একটি বাছুর ঠিক করিয়া আনিল, দোহাইবার লোক আনিতেও ভুলিল না। কেহ সোনার বাসনে, কেহ রুপোর বাসনে, কেহ লোহার হাঁড়িতে, কেহ পাথরের বাটিতে, কেহ লাউয়ের খোলায়, কেহ পদ্ম পাতায় এমন করিয়া তাহারা কত রকমের জিনিসে যে দোহাইয়া নিল, তাহা শেষ করা যায় না। তথাপি দুধে কম পড়ে নাই।

পৃথিবী বাঁচিয়া গেল। এত জিনিস যাহার কাছে পাওয়া যায়, তাহাকে কি বুদ্ধিমান লোকে মারে? কাজেই পৃথু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

পৃথু তাহাকে প্রাণদান করিয়াছিলেন, তাই আজও পৃথিবী বাঁচিয়া আছে—আর, প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথু পৃথিবীর পিতার তুল্য হইলেন। সেইজন্য পৃথিবীকে পৃথুর কন্যা বলা হয়, আর তার নাম হইয়াছে ‘পৃথিবী’ বা ‘পৃথ্বী’।

যাহা হউক, পৃথিবীর নামের অন্যরূপ অর্থও দেখা যায়। পৃথ্বী বলিতে খুব বড়ও বুঝায়। পৃথিবী যে খুবই বড় তাহাও তো আমরা দেখিতেই পাইতেছি। সুতরাং পৃথিবী নাম যথার্থই রহিয়াছে।

সূর্যের গৃহিণী

বিশ্বকর্মার নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। বিশ্বকর্মা দেবতাদের কারিগর, আর কারিগরদের দেবতা। এই দেবতার একটি মেয়ে ছিল, তাঁহার নাম সংজ্ঞা; কেহ কেহ তাঁহাকে উষা আর সুরেণু বলিয়াও ডাকিত।

বাপের ঘরে সংজ্ঞা সুখেই ছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার পিতা যখন সূর্যদেবের

সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, তখন হইতেই বেচারির দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। সূর্যের যে কী ভয়ানক তেজ, তাহা তোমরা সকলেই দেখিতেছ। দূরে থাকিয়াই এত তেজ, কাছে গেলে সে কি রকম হইবে তাহা তো আমরা ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। এর উপর আবার সেকালে নাকি সূর্যের তেজ এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। তখন সূর্যের দেহ এমন সুন্দর গোল ছিল না, কদম ফুলের কেশরের মত ছিল, তাহার চারি দিকে কিরণের ছটা বাহির হইত; তাহার সে কী ভয়ঙ্কর তেজ, তাহা বেচারি সংজ্ঞাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তবু সে তেজ সহিয়া থাকিতে সংজ্ঞা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ঝলসিয়া, পুড়িয়া, ফোস্কা পড়িয়া, তাঁহার দুর্দশার একশেষ হইল, তবু তিনি অনেক দিন ধরিয়া সূর্যের সেবা করিলেন। ক্রমে মনু, যম আর যমুনা বলিয়া তাঁহার তিনটি খোকা খুকি হইল। খোকা খুকিরা দূরে দূরে খেলা করিয়া বেড়ায়; তাহাদের কোন কষ্ট নাই। যত কষ্ট সংজ্ঞার, কেন না তাঁহাকে সূর্যের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়। এতদিন সে কষ্ট সহিয়া তাঁহার শরীর মাটি হইয়া গেল, আর সহিতে পারেন না।

তখন সংজ্ঞা অনেক ভাবিয়া এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। বিশ্বকর্মার মেয়ে, কাজেই অনেক রকম কারিকুরি তাঁহার জানা ছিল। আর সেই কারিকুরিতে তখন তাঁহার বড়ই সুবিধা হইল। তিনি সকলের অসাক্ষাতে এমন একটি মেয়ে তৈয়ার করিলেন যে, সে দেখিতে অবিকল তাঁহার নিজেরই মতন, কিন্তু সূর্যের তেজে তাহার কিছুই হয় না। মেয়েটির নাম রাখিলেন ছায়া।

ছায়া তৈয়ার হওয়ামাত্র হাত জোড় করিয়া সংজ্ঞাকে বলিল, 'আমাকে কী করিতে হইবে?' সংজ্ঞা বলিলেন, 'আমি বাপের বাড়ি যাইতেছি। তুমি এখানে থাকিয়া ঘরকন্না কর। আমার খোকা খুকিদের যত্ন করিয়া খাইতে পরিতে দিও। আর, আমি যে চলিয়া গেলাম, একথা কাহাকেও বলিও না।'

ছায়া বলিল, 'আমি সবই করিব, কিন্তু যদি আমার চুল ধরিতে আসে, বা শাপ দিতে চায়, তবে আমি চুপ থাকিতে পারিব না।'

এইরূপ কথাবার্তার পর সংজ্ঞা ছায়াকে রাখিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্মা কিন্তু কন্যার দুঃখ বুঝিতে পারিলেন। তিনি সংজ্ঞাকে দেখিয়া আশ্চর্য তো হইলেনই, বিরক্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশি। তিনি বলিলেন, 'তুমি ভারি অন্যায় করিয়াছ, এখনি ফিরিয়া যাও।'

বাপের বাড়িতে আসিয়াও সংজ্ঞার দুঃখ ঘুচিল না। বকুনির জ্বালায় সেখানে টিঁকিয়া থাকাই তাঁহার দায় হইল। কাজেই তখন আর কী করা যায়? সংজ্ঞা একটি ঘোটকী সাজিয়া সেখান হইতে উত্তর মুখে ছুটিয়া পালাইলেন। সকল দেশের উত্তরে কুরুবর্ষ বা উত্তর কুরু। সেখানকার সুন্দর সবুজ মাঠের কচি কচি ঘাসগুলি খাইতে বড়ই মিষ্ট। সংজ্ঞা ছুটিতে ছুটিতে সেই দেশে গিয়া, সেখানকার সুন্দর মাঠের মিষ্ট ঘাস খাইয়া মনের আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সেখানে

পড়িয়াও মরিতে হয় না, বকুনিও খাইতে হয় না।

এদিকে সূর্যদেবের ঘরে কাজকর্ম সুন্দর মতই চলিতেছে। ছায়া দেখিতে ঠিক সংজ্ঞারই মত, আর কাজেকর্মেও বেশ ভাল। সুতরাং সূর্যদেব টেরই পান নাই যে একটা কিছু হইয়াছে। খোকা খুকিরা কিন্তু ইহার মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের মা আর তাহাদিগকে ভালবাসে না। তাহারা জানুক আর নাই জানুক, ছায়া তো আর তাদের মা নয়। সে তাহাদিগকে মার মত ভালবাসিবে কী করিয়া? মনু শান্ত ছেলে, সে আদর না পাইয়াও চুপ করিয়া রহিল। যম রাগী, সে অভিমানের ভয়ে ছায়াকে পা দেখাইয়া বলিল, 'তোমাকে লাথি মারিব!' ছায়াও তখন রাগে অস্থির হইয়া বলিল, 'বটে! এত বড় আস্পর্ধা? তোর ঐ পা খসিয়া পড়ুক!'

শাপের ভয়ে যম কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্যের নিকট গিয়া নালিশ করিল, 'বাবা, মা আমাদের ভালবাসেন না বলিয়া আমি তাঁহাকে পা দেখাইয়াছিলাম, তাহাতে বলিয়াছেন, আমার পা খসিয়া যাইবে। বাবা, আমি তো আর লাথি মারি নাই, তুমি আমার পা খসিয়া পড়িতে দিও না!' সূর্য বলিলেন, 'বাবা, তোমার মা যখন শাপ দিয়াছেন, তখন তো আর তাহা আটকাইবার উপায় নাই। তবে, এইটুকু করা যাইতে পারে যে পোকায় তোমার পায়ের মাংস অল্পে অল্পে লইয়া খাইবে, আস্ত পা খসিয়া পড়ার দরকার হইবে না।'

তারপর সূর্যদেব ছায়ার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি মা হইয়া ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেছ?' ছায়া প্রথমে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তারপরই যখন সূর্য বিষম রাগের ভরে তাঁহার চুল ধরিয়া শাপ দিবার আয়োজন করিলেন, তখন আর সে না বলিয়া যায় কোথায়?

সে কথা শুনিয়া সূর্য যে কিরূপ ব্যস্তভাবে তাঁহার শ্বশুরের নিকট ছুটিয়া আসিলেন, তাহা কী বলিব। বিশ্বকর্মা দেখিলেন, ঠাকুর বড় বেজায় রকমের চটিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথাই বাহির হইতে পারিতেছে না। তখন তিনি তাঁহাকে অনেক মিষ্ট কথায় শান্ত করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, জানেন তো আপনার তেজ কী ভয়ঙ্কর। আমার মেয়ে সে তেজ কিছুতেই সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছে। তবে আপনি যদি চাহেন তো আপনার এই তেজ আমি অনেকটা কমাইয়া দিতে পারি। তাহা হইলে সংজ্ঞারও আপনার নিকট থাকিতে হইবে না, আর আপনার চেহারাটাও অনেক মোলায়েম হইয়া যাইবে।'

সূর্য বাস্তবিকই সংজ্ঞাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মার কথায় রাজী হইলেন। বিশ্বকর্মাও আর দেরী না করিয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে কুঁদে চড়াইয়া দিলেন। আগেই বলিয়াছি, সূর্য সে সময়ে তেমন গোল ছিলেন না। কুঁদে চড়াইয়া শোঁ-শোঁ শব্দে কয়েক পাক দিতেই তাঁহার উস্ক-খুস্ক কিরণগুলি বাটালির মুখে উড়িয়া গেল আর তাহার ভিতর হইতে তাঁহার সুন্দর গোল মুখখানি দেখা দিল, তখন সকলেই বলিল, 'বাঃ, বেশ হইয়াছে! এখন ঠাকুর

যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি দেখিতেও ভাল।'

এ কথায় সূর্যদেব যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া সংজ্ঞাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সংজ্ঞা ঘোটকী সাজিয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে কোন্ দিকে যাইতে হইবে তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। সংজ্ঞা সাজিয়াছিলেন ঘোটকী, তিনি সাজিলেন ঘোড়া। তারপর যে সেখান হইতে তিনি চিঁ-হীঁ-হীঁ-হীঁ শব্দে ছুট দিলেন, আর একেবারে সংজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া থামিলেন না। কিন্তু সংজ্ঞাকে তিনি সহজে ধরিতে পারেন নাই, কারণ সে বেচারী কী করিয়া জানিবেন যে, ঐ যে চিঁ-হীঁ-হীঁ-হীঁ শব্দে ঘোড়াটি ছুটিয়া আসিতেছে সেই হইতেছে তাঁহার স্বামী? কাজেই তিনি তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষে সকল গোলমাল চুকিয়া গেল, আর তখন তো সুখের সীমাই রহিল না।

রেবতীর বিবাহ

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল রৈবত ককুমী। পশ্চিম সমুদ্রের ধারে কুশস্থলী নামক নগরে তিনি বাস করিতেন। রৈবতের একটি কন্যা ছিল, তাহার নাম রেবতী। রেবতীর গুণের কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। মেয়েটি দেখিতে যেমন অপরূপ সুন্দরী তেমনি সুশীলা ও মিষ্টভাষিণী আর বুদ্ধিমতীও যতদূর হইতে হয়।

রেবতী যতই বাড়িয়া উঠিলেন, রাজার মনেও ততই ভাবনা হইল যে, 'আহা! আমার এই স্নেহের মেয়েটিকে এখন কাহার হাতে সমর্পণ করি?'

সংসারের যত ভাল ভাল রাজপুত্র একে একে সকলের সংবাদই রাজা লইলেন, কিন্তু কাহাকেও তাঁহার পছন্দ হইল না। মন্ত্রী, পুরোহিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই বলিলেন, কেহই তেমন ভাল একটি পাত্রের সন্ধান দিতে পারিল না।

শেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন—'ব্রহ্মার কাছে যাই, তিনি অবশ্যই আমার মনের মতন একটি ছেলের কথা বলিতে পারিবেন।'

এই ভাবিয়া রাজা কন্যাটিকে লইয়া ব্রহ্মার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হাহা আর হূহূ নামে দুইজন গন্ধর্ব সেইখানে বসিয়া ব্রহ্মাকে গান শুনাইতে-ছিলেন। হাহা আর হূহূর মত ওস্তাদ আর এই ত্রিভুবনে কখনও দেখা যায় নাই, তাঁহাদের সেই বিচিত্র সঙ্গীত শুনিতে যে কী মিষ্ট লাগিতেছিল, তাহা কী বলিব! সে গান একবার শুনিতে আরম্ভ করিলে আর সকল বিষয়ের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। যতক্ষণ সে গানের শেষ না হয় ততক্ষণ আর উঠিয়া আসিবার জো থাকে

না। সে আশ্চর্য গান আরম্ভ হইলে আর শীঘ্র শেষ হইতে চাহে না। সেটা ছিল ত্রেতাযুগের আরম্ভ। গাহিতে গাহিতে সে যুগ শেষ হইয়া গেল, তারপর দ্বাপর আসিল, তাহাও প্রায় শেষ হইতে চলিল, তবে হাহা হুহু গান শেষ করিয়া তম্বুরা নামাইলেন। এত কাল যে চলিয়া গিয়াছে, রাজার কিন্তু সে খেয়ালই নাই। তিনি ভাবিতেছেন, 'আহা এমন সুন্দর গান মুহূর্তের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল!'

যাহা হউক, এখন নিজের কাজ সারিয়া লইতে হইবে, আর বিলম্ব করা ভাল নহে। এই ভাবিয়া রাজা ব্রহ্মার সিংহাসনের সামনে গিয়া ভক্তিভরে প্রণামের পর জোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান! আমার এই কন্যাটির বিবাহ কাহার সঙ্গে দিব, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন। আমি অনেক রাজপুত্রের সন্ধান লইয়াছি, কিন্তু ইহাদের কোনটি যে সকলের চেয়ে ভাল, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি কাহার কাহার কথা ভাবিয়াছ আমাকে বল দেখি।'

সে কথায় রাজা অনেকের নাম করিয়া বলিলেন, 'ইহাদের মধ্যে একটি হইলে আমি সুখী হইতাম।' তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি যাহাদের নাম করিলে, এখন তো তাহাদের কেহই বাঁচিয়া নাই, তাহারা ছিল ত্রেতা-যুগের লোক, আর এখন হইল দ্বাপরের শেষ। এতদিনে তাহাদের ছেলের ছেলে নাতির নাতি অবধি মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের রাজ্য, বংশ, নাম অবধি লোপ পাইয়াছে।'

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ যে, পৃথিবীর আর সব লোক মরিয়া গেল, আর শুধু রাজা আর তাঁহার মেয়েটি বাঁচিয়া রহিয়াছেন, এ কেমন কথা হইল?

কিন্তু সে যে ব্রহ্মার পুরী, সেখানে তো জরা মৃত্যুর অধিকার নাই। কাজেই তাঁহারা দুইজন যে বাঁচিয়া আছেন, তাহাই নহে, ঠিক যেমনটি গিয়াছিলেন তেমনি আছেন, একটুও বুড়া হন নাই।

যাহা হউক, ব্রহ্মার কথায় রাজা নিতান্তই আশ্চর্য হইলেন আর ভয় পাইলেন, আর ব্যস্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশি।

তিনি বিষম থতমত খাইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ, অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! তাই তো! প্রভু, এখন উপায়? এখন তবে আমার এই মেয়েটিকে কাহার হাতে দিই? আমার সমকক্ষ রাজা এখন কে কে আছেন?'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'মহারাজ! এতদিনে কি আর তোমার সে রাজ্য আছে? তোমার রাজ্যও নাই, প্রজারাও নাই। তোমার সুন্দর কুশস্থলী নগরটি অবধি নাই। তাহার জায়গায় এখন দ্বারকা নামক পুরী হইয়াছে। সেই দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ, তাঁহার ভাই বলরাম। সেই বলরামের সঙ্গে গিয়া তোমার এই কন্যার বিবাহ দাও। এ মেয়েটি যেমন লক্ষ্মী, বলরামও তেমনি মহাশয় লোক, সকল রকমেই ইহার উপযুক্ত।'

কাজেই রাজা তখন আর কি করেন? তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, বাস্তবিকই

তাঁহার রাজ্য, রাজধানী, লোকজন, আত্মীয়স্বজন সব লোপ পাইয়াছে। পৃথিবী আর সে পৃথিবীই নাই। তাঁহাদের সময়ে চোদ্দ হাত লম্বা এক-একটা মানুষ হইত, আর এখানকার লোকগুলি মোটে সাত হাত লম্বা। আর তাহাদের চাল-চলনও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আর দুঃখ করিয়া কী হইবে? রাজা বলরামকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিয়া বনবাসী হইলেন।

এদিকে রেবতীকে পাইয়া বলরামের আর আনন্দের সীমাই নাই। কেবল একটি ব্যাপারে তিনি একটু মুশকিলে পড়িলেন,—বলরাম হইলেন দ্বাপরযুগের লোক, তিনি সাত হাত লম্বা, রেবতী ত্রেতাযুগের মেয়ে, তিনি চোদ্দ হাত লম্বা—বলরাম প্রাণপণে হাত বাড়াইয়াও তাঁহার মাথা নাগাল পান না।

তখন বলরাম করিলেন কি, তাঁহার লাঙলের আগা দিয়া রেবতীকে চাপিয়া অন্যান্য মেয়েদের মত বেঁটে করিয়া লইলেন। তারপর আর কোন অসুবিধা রহিল না।

কুবলয়াশ্ব

পূর্বকালে শত্রুজিৎ নামে অতি বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ঋতধ্বজ। ঋতধ্বজের গুণের কথা আর কী বলিব। যেমন রূপ, তেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি বিনয়, তেমনি বল, তেমনি বিক্রম। এমন পুত্র লাভ করিয়া রাজা শত্রুজিৎ খুবই খুশী হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কী?

ইহার মধ্যে একদিন গালব নামে এক মুনি একটি সুন্দর ঘোড়া লইয়া রাজা শত্রুজিতের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমি বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। একটি দুষ্ট দৈত্য আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে। সে কখনও সিংহ, কখনও বাঘ, কখনও হাতি, কখনও আর কোন জন্তুর বেশে আসিয়া দিবারাত্র আমাকে অস্থির রাখে, উহার জ্বালায় আমার তপস্যাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে শাপ দিয়া উহাকে বধ করিতে পারি, কিন্তু উহাতে তপস্যার হানি হয়; কাজেই আর কী করিব, শুধু নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি। এমন সময় একদিন এই ঘোড়াটি আকাশ হইতে আমার নিকট পড়িল, আর দৈববাণী হইল যে, "গালব! এই ঘোড়াটির নাম কুবলয়। ইহার কিছুতেই ক্লান্তি নাই, সংসারে ইহার অগম্য স্থান নাই, ইহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ ইহাতে চড়িয়া তোমার শত্রু সেই দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত হইবে। মহারাজ, তাই আমি এই ঘোড়াটি লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার পুত্র যদি ইহাতে চড়িয়া দানবটাকে তাড়াইয়া দেন, তবেই এই ব্রাহ্মণের তপস্যা হয়।'

রাজার আজ্ঞায় তখনই ঋতধ্বজ সেই আশ্চর্য ঘোড়ায় চড়িয়া মুনির সঙ্গে তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। তারপর মুনিরা সকলে তাঁহাদের সন্ধ্যা-বন্দনা আরম্ভ করিতে না করিতেই সেই দুষ্ট দানব শূকর সাজিয়া উপস্থিত হইল। মুনির শিষ্যরা তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে চ্যাঁচাইতে লাগিল। রাজপুত্র তখনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। তাঁহার হাতের অর্ধচন্দ্র বাণের খোঁচা খাইয়া আর কি দুষ্ট দানব সেখানে দাঁড়ায়? সে প্রাণের মায়ায় কোন্ পথে পলায়ন করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পাহাড়ে, বনে, শূন্যে, সাগরে, যেখানে যায়, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া ধনুর্বাণ হাতে সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হন। এইভাবে চারি হাজার ক্রোশ চলিয়া শেষে সে একটা গর্তের ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। রাজপুত্রও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গর্তে গিয়া ঢুকিলেন বটে, কিন্তু সেখানকার সেই ঘোর অন্ধকারের ভিতরে আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

রাজপুত্র সেই গর্তের পথে দানবকে খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আর অন্ধকার নাই, সেখানে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় অতি অপরূপ সোনার পুরী। রাজপুত্র তাহার ভিতরে কতই খুঁজিলেন, কিন্তু দানবকে পাইলেন না। ছিল কেবল দুটি মেয়ে। তাহার একটি যে কী সুন্দর, সে আর বুঝাইবার উপায় নাই।

এই কন্যার নাম মদালসা, তাঁহার বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য। ইহার পিতার নাম বিশ্বাবসু, তিনি গন্ধর্বের রাজা। মদালসা তাঁহার পিতার বাগানে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। সেই অন্ধকার আর কিছুই নহে, উহা পাতালকেতু নামে দুষ্ট দানবের মায়া। দুরাত্মা অন্ধকারের ভিতরে সেই অসহায়া বালিকাকে লইয়া পলায়ন করিল, কেহ সে কথা জানিতে পারিল না। তাঁহার আর্তনাদও কেহ শুনিতে পাইল না।

সেই দুষ্ট তাহাকে পাতালে আনিয়া নিজ বাড়িতে আটকাইয়া রাখিয়াছে, বলিয়াছে যে ভাল দিন পাইলেই তাহাকে বিবাহ করিবে।

ইহার মধ্যে একদিন মদালসা মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিতে যান, তখন সুরভি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বাছা, তোমার কোন ভয় নাই, এই দুষ্ট দানব তোমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ইহার মৃত্যু যাহার হাতে হইবে, তিনিই তোমাকে বিবাহ করিবেন।'

রাজপুত্র মদালসার সঙ্গের মেয়েটির নিকট এ সকল সংবাদ শুনিতে পাইলেন। মেয়েটির নাম কুণ্ডলা, তিনি একজন তপস্বিনী এবং মদালসার সখী। কুণ্ডলা আরও বলিলেন যে, সেদিন পাতালকেতু শূকর সাজিয়া মুনিদের আশ্রম নষ্ট করিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে এইমাত্র সে সাংঘাতিক বাণের খোঁচা খাইয়া আসিয়াছে।

তখন আর ঋতধ্বজের বুঝিতে বাকি রহিল না যে তিনিই সেই রাজপুত্র, আর পাতালকেতুই তাঁহার সেই দানব।

সে কথা শুনিয়া মেয়ে দুটির যে আনন্দ হইল !

রাজপুত্রকে দেখিয়াই মদালসার যারপরনাই ভাল লাগিয়াছিল, আর সেজন্য তাঁহার মনে দুঃখও হইয়াছিল যতদূর হইতে হয়। কেননা, ইঁহাকে তো আর পাওয়ার আশাই নাই, যেহেতু সুরভি বলিয়াছিলেন, যে দানব মারিবে সে-ই মদালসাকে বিবাহ করিবে।—তাঁহার কথা বৃথা হইবার নহে।

যাহা হউক, এখন সে ভয় কাটিয়া গেল, সুতরাং দুঃখের জায়গায় আনন্দ হইল তাহার চতুর্গুণ। তবে আর বিলম্ব কেন ? তখনই পুরোহিত তুম্বুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পবিত্র আগুন জ্বলিল, ঘৃতের আহুতি পড়িল, মন্ত্রের ধ্বনি উঠিল, শুভকার্য শেষ হইল।

তারপর কুণ্ডলা আবার তপস্যা করিতে গেলেন। রাজপুত্র মদালসাসহ সেই আশ্চর্য ঘোড়ায় চড়িয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। অমনি পাতাল কাঁপাইয়া ভীষণ চিৎকার উঠিল 'নিয়া গেল রে, নিয়া গেল ! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয় তোরা !'

তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দানব কোথা হইতে খাঁড়া, ঢাল, গদা, শূল হাতে আসিয়া 'মার, মার !' শব্দে ঋতধ্বজকে আক্রমণ করিল।

ঋতধ্বজ তখন করিলেন কি, তাঁহার তূণ হইতে ত্বাষ্ট্র নামক অস্ত্রখানি লইয়া মারিলেন তাহা সেই দানবের ভেঙ্‌চির ভিড়ের উপর ছুঁড়িয়া। অমনি দানবের দল চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে পলকের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, রাজপুত্রও মনের সুখে মদালসাকে লইয়া দেশে চলিয়া আসিলেন। তখন সেখানে না জানি কেমন বাজি, বাদ্য আর ভোজের ঘটা হইল ! না জানি সকলে কতদিন ধরিয়া কত কী খাইল !

ইহার পর হইতে ঋতধ্বজের নাম হইল কুবলয়াশ্ব। এখন তিনি রাজার আজ্ঞায় প্রতিদিনই সেই ঘোড়ায় মুনিদের আশ্রম হইতে দানব তাড়াইয়া বেড়ান। ইহার মধ্যে হইয়াছে কি, সেই পাতালকেতুর ভাই ছিল তালকেতু, সে বেটা দিব্যি একটি শুদ্ধ শান্ত মুনি সাজিয়া যমুনার ধারে আশ্রম করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে, যেন সে ভারী একটা তপস্বী।

কুবলয়াশ্ব সেই পথে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন, এমন সময় সে চোখ মিটমিট করিতে করিতে তাহাকে আসিয়া বলিল, 'রাজপুত্র ! আমার একটা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু দক্ষিণা দিবার পয়সা নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার গলার ঐ হারখানি আমাকে দেন, তবে আমার সাধ পূর্ণ হইবে।'

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ গলার হার তাহাকে দিলেন। তখন সে আবার বলিল, 'আপনার জয় হোক ! এখন তবে আর একটি কাজ যদি করেন,—আমি জলের ভিতরে থাকিয়া বরুণের স্তব করিতে যাইব, ততক্ষণ আমার আশ্রমটির উপর একটু চোখ রাখিবেন।'

রাজপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। তালকেতুও চলিয়া গেল। কিন্তু সে তো তপস্যা করিতে গেল না, সে সোজাসুজি কুবলয়াশ্বের বাড়িতে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'হায়, হায় ! ওগো, সর্বনাশ হইয়াছে ! রাজপুত্রকে দানবে

মারিয়াছে ! মৃত্যুর সময়ে তিনি এই হার আমার হাতে দিয়া বাড়িতে সংবাদ দিতে বলিয়াছেন।'

কুবলয়াশ্বের হার দেখিয়া আর কাহারও এ কথায় অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না। তখন দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল ; সে দারুণ সংবাদ সহিতে না পারিয়া মদালসা প্রাণত্যাগ করিলেন।

ততক্ষণে সেই দুষ্ট তালকেতু আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কুবলয়াশ্বকে বলিল, 'আহা ! আপনি আমার বড়ই উপকার করিলেন ! আপনি এখানে থাকায় আমি প্রাণ ভরিয়া যজ্ঞ করিয়াছি ! এখন তবে আপনি ঘরে ফিরিয়া যাউন।'

একথায় রাজপুত্র তথা হইতে চলিয়া আসিল, দুষ্ট ঘরে বসিয়া হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল।

কুবলয়াশ্ব সেই মুনিবেশধারী দুষ্ট দানবের আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলে কিরূপ আশ্চর্য আর আহ্লাদিত হইল তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু মদালসার মৃত্যুর কথা শুনিয়া কুবলয়াশ্বের মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি সেই দুঃখ ভুলিবার জন্য বন্ধুদিগের সহিত মিশিয়া নানারূপ আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগরাজ অশ্বতরের দুইটি পুত্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে আসিতেন। ইঁহাদের কথাবার্তা তাঁহার বড় ভাল লাগিত। এইরূপে তাঁহাদের সহিত কুবলয়াশ্বের এমনি বন্ধুত্ব হইয়া গেল যে তাঁহাদের ছাড়িয়া থাকিতে আর কিছুতেই ভাল লাগিত না। নাগপুত্রেরাও সমস্ত দিন কুবলয়াশ্বের নিকটে কাটাইয়া রাত্রে গৃহে যাইতে বড়ই কষ্টবোধ করিতেন, আর কোন প্রকারে রাত্রিটি কাটাইয়া প্রভাত হইবামাত্রই পুনরায় কুবলয়াশ্বের নিকট চলিয়া আসিতেন।

একদিন নাগরাজ অশ্বতর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'বাবা, এখন তো আর তোমাদিগকে দিনের বেলায় পাতালে দেখিতে পাই না, রাত্রিটি কোন মতে এখানে কাটাইয়া প্রভাত হইতেই তোমরা পৃথিবীতে চলিয়া যাও। ঐ স্থানটার প্রতি তোমাদের এত অনুরাগ কেমন করিয়া হইল ?'

নাগপুত্রেরা বলিলেন, 'বাবা, আমরা মহারাজ শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজকে বড়ই ভালবাসি ; তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে আমাদের নিতান্তই কষ্ট হয়। তাই প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট চলিয়া যাই। বাবা, এমন সুন্দর, এমন সরল, এমন ধার্মিক, এমন মিষ্টভাষী লোক আর এ জগতে নাই।'

এ কথায় নাগরাজ বলিলেন, 'বাছা, এমন মহৎ লোকের সহিত তোমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছে, আর তাঁহার নিকটে তোমরা এত সুখ পাইতেছ,—তোমরা তাঁহার সুখের জন্য কি কিছু করিয়াছ ?'

নাগপুত্রেরা বলিলেন, 'তাঁহার তো কোন বস্তুরই অভাব নাই ; এমন মহৎ লোকের যোগ্য কী আছে, যাহা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে পারি ?' তাঁহার কোন কষ্ট দূর করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয় করিতাম। তাঁহার স্ত্রী মদালসার মৃত্যুই

তাঁহার একমাত্র কষ্টের কারণ, সেই মদালসাকে আমরা কোথা হইতে আনিয়া দিব ?'

কিন্তু এ কাজটি যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা যে একেবারেই অসাধ্য, নাগ-রাজ তাহা মনে করিলেন না। তিনি অবিলম্বে হিমালয় পর্বতের প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে তপস্যা এমনই চমৎকার হইয়াছিল, আর তখন যে নাগরাজ সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন তাহা সরস্বতীর এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি আর সেখানে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

সরস্বতী আসিয়া বলিলেন, 'হে অশ্বতর! আমি তোমাকে বর দান করিব, বল তোমার কী লইতে ইচ্ছা হয়।'

অশ্বতর অমনি করজোড়ে বলিলেন, 'মা, যদি কৃপা হইয়া থাকে, তবে আমাকে আর আমার ভাই কম্বলকে সঙ্গীতে অসাধারণ পণ্ডিত করিয়া দিন।'

এ কথায় সরস্বতী 'তথাস্তু' বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলে অশ্বতর আর কম্বল দুই ভাই তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত-শক্তি লাভ করিয়া অপরূপ তান লয় সহকারে বীণা বাজাইয়া মহাদেবের স্তবগান আরম্ভ করিলেন। অনেক দিন এইরূপ সঙ্গীত আর স্তবের পর মহাদেবকেও তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিতে আসিতে হইল। তখন দুই ভাই তাঁহার পদতলে পড়িয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, 'কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসা যেমন বয়সে, যেমন বেশে, যেমন শরীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, অবিকল সেই মূর্তিতে, পূর্বজন্মের সকল কথা স্মরণে রাখিয়া পুনরায় অশ্বতরের গৃহে জন্মলাভ করুন।'

মহাদেব কহিলেন, 'তাহাই হউক। অশ্বতর শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে মদালসা অবিকল তাঁহার পূর্বের শরীর হইয়া বাহির হইবেন।'

কী আনন্দের কথা হইল! ইহার পর দুই ভাই পাতালে চলিয়া আসিতে আর তিলমাত্র বিলম্ব করিলেন না। সেখানে আসিয়া অশ্বতর একটি নির্জন স্থানে চুপি-চুপি শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহাদেবের কথামত মদালসা তাঁর মধ্যম ফণা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অবিকল সেই মদালসা, প্রভেদ নাই, যেন দুদিনের জন্য কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে পাতালে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এ ব্যাপারে কেবল অশ্বতরই উপস্থিত ছিলেন; আর কেহ ইহা দেখিলও না, এ বিষয়ে কোন কথা জানিতেও পারিল না।

তখন নাগরাজ কয়েকটি বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষিণী সখী সঙ্গে দিয়া মদালসাকে একটি সুন্দর ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন।

তারপর সন্ধ্যাকালে নাগপুত্রেরা দু ভাই কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারাও অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। নাগরাজ অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া কহিলেন, 'বৎসগণ, সেই রাজপুত্রকে একদিন আমার নিকটে আনিলে না কেন ?'

পরদিন নাগপুত্রেরা কুবলয়াশ্বের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'বন্ধু, আমাদের পিতা তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছেন, একটিবার আমাদের

ঘরে চল।'

এ কথায় কুবলয়াশ্ব সম্মত হইলে তিনজনে মিলিয়া তখনই পাতালে যাত্রা করিলেন। কুবলয়াশ্ব কিন্তু জানেন না যে তাঁহাকে পাতালে যাইতে হইবে, বা তাঁহার বন্ধুগণ নাগপুত্র। তিনি জানেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণকুমার। গোমতী নদীতে আসিয়া নাগপুত্রেরা তাহার জলে নামিতে গেলেন ; কুবলয়াশ্ব ভাবিলেন, গোমতীর পরপারে ব্রাহ্মণদের বাড়ি। এমন সময় নাগপুত্রেরা হঠাৎ তাঁহাকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে কুবলয়াশ্ব ভয় পাইলেন না, কেননা সে স্থান তাঁহার দেখিতে বাকি নাই। যাহা হউক, সেবারে তিনি দানবের বাড়িই দেখিয়াছিলেন, এবারে সাপের দেশটিও তাঁহার নিকট যারপরনাই আশ্চর্য এবং সুন্দর বোধ হইল। তাঁহার বন্ধুদ্বয়ও ততক্ষণে ব্রাহ্মণের বেশ ছাড়িয়া নিজের রূপ ধারণ করিয়াছেন। সে রূপ যে ঠিক কি প্রকার, তাহা আমি বলিতে পারি না! যে সকল সাপের ফণার কথা লেখা আছে, স্বস্তিক চিহ্ন (সাপের ফণায় যে 'চক্র' থাকে) এবং মণিরও উল্লেখ দেখা যায়। অথচ মানুষের মত তাহাদের হাত-পা, বেশভূষা, কানে কুণ্ডল, গলায় হার।

যাহা হউক কুবলয়াশ্বকে অবিলম্বেই তাঁহার পিতার নিকট লইয়া উপস্থিত করিলেন, সেখানে সেরূপ অবস্থায় যেমন কথাবার্তায়, প্রণাম, আশীর্বাদাদির প্রথা আছে সকলই হইয়া গেল। এত পথ চলিয়া আসিতে সকলেই ক্লান্ত, সুতরাং অতঃপর স্নানাহারপূর্বক সুস্থ হওয়া হইল প্রথম কাজ।

আহারান্তে বিশ্রামের পর নাগরাজ আর কুবলয়াশ্বের অনেক কথাবার্তা হইল। শেষে নাগরাজ বলিলেন, 'বাছা, তুমি আমার পুত্রগণের বন্ধু, সুতরাং আমার পুত্রের মতন। আমারও তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ হইয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমার পুত্রেরা যেমন আমার নিকট যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লয়, তুমিও সেইরূপ কিছু চাহিয়া লও!'

কুবলয়াশ্ব বলিলেন, 'আপনার আশীর্বাদে আমার কোন বস্তুরই অভাব নাই, সুতরাং আমি কী আর চাহিব ? আমি যে আপনাকে দেখিলাম, আপনার পায়ের ধুলা পাইলাম, ইহার উপর আর আমার কিছুই চাহিবার নাই।'

অশ্বতর কহিলেন, 'বাবা, তোমার মনে কি কোন কষ্ট আছে ? তাহার কথাই না হয় আমাকে বল, আমি সাধ্যমত তাহা নিবারণের চেষ্টা করিব।'

এ কথায় নাগপুত্রেরা বলিলেন, 'মদালসার মৃত্যুতে ইহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা তো আর দূর হইবার নহে!'

অশ্বতর বলিলেন, 'অবশ্য মরা মানুষকে আর কী করিয়া বাঁচানো যাইবে ? তবে মন্ত্রবলে তাহারও মায়া মূর্তি আনিয়া দেখাইতে পারি।'

ইহা শুনিয়া কুবলয়াশ্ব নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে দয়া করিয়া একবার তাহাই দেখান।'

অশ্বতর বলিলেন, 'এই কথা ? আচ্ছা, তবে দেখাইতেছি। কিন্তু মনে রাখিও

ইহা মায়া।'

তারপর অশ্বতর খুব গম্ভীরভাবে বসিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিলেন, যেন কতই মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইতেছেন। ততক্ষণে তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে মদালসাকে সেখানে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সকলে ভাবিল, মন্ত্রের কী জোর! কুবলয়াশ্বও জানেন, উহা মন্ত্রেরই কাজ মায়ার মূর্তি। তথাপি তাঁহার এত আনন্দ হইল যে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

তারপর যখন অশ্বতর বলিলেন যে উহা মায়া নহে, বাস্তবিকই মদালসা, তখন না জানি ব্যাপারখানা কিরূপ হইয়াছিল!

কুবলয়াশ্ব পাতালেই মদালসাকে পাইয়াছিলেন, এখন সেই পাতালেই তাহাকে আবার পাইয়া মহানন্দে তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। সেখানে অবশ্য ইহা লইয়া খুবই আনন্দ আর উৎসবাদি হইল।

কৃষ্ণের কথা

পূতনা বলিয়া একটা বড়ই ভীষণ রাক্ষসী কংসের রাজ্যে বাস করিত। ছোট ছোট ছেলেদিগকে কৌশলে বধ করাই ছিল ইহার ব্যবসা। রাত্রিকালে কোন খোকা খুকি এই হতভাগিনীর দুধ পান করিলে আর তাহাদের রক্ষা ছিল না। সে-সব খোকা খুকির দেহ তখনই চূর্ণ হইয়া যাইত।

যখন জানা গেল যে কংসকে মারিবার লোকের জন্ম হইয়াছে, অমনি সে দুষ্ট এই পূতনাকে ডাকিয়া বলিল যে 'যত ষণ্ডা ষণ্ডা খোকা দেখিবে, সকলকেই বধ করিতে হইবে।' তদবধি সেই হতভাগিনী কেবলই ছোট ছোট খোকা মারিয়া বেড়ায়। এমন করিয়া কত খোকার প্রাণ সে হরণ করিল তাহার সংখ্যা নাই।

নন্দের একটি খোকা হইয়াছে শুনিয়া এই রাক্ষসী একদিন গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কিন্তু তাহার রাক্ষসী মূর্তি ছিল না। সে এমনি সুন্দর একটি মেয়ে সাজিয়া, এমনি সুন্দর বেশভূষা করিয়া, এমনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া আসিয়াছিল যে তাহাকে দেখিয়া সকলে ভাবিল, নিশ্চয় স্বয়ং লক্ষ্মী গোকুলে আসিয়াছেন। সে রাক্ষসী যেদিকে যায়, সকলে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া জড়সড় ভাবে সরিয়া দাঁড়ায়। দুষ্ট রাক্ষসী ধীরে ধীরে সূতিকা ঘরে ঢুকিল, কেহই তাকে নিষেধ করিল না। সে ঘরে যশোদা ছিলেন, বলরামের স্ত্রী রোহিণীও ছিলেন; তাঁহারা তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাক্ষসী এক পা দুই পা করিয়া আসিয়া বিছানার পাশে বসিল ও হাসিতে হাসিতে, যেন কতই আদরে খোকাটিকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে লাগিল। যশোদাও কিছু বলিলেন না, রোহিনীও কিছু বলিলেন না, রাক্ষসীর মায়ায় তাঁহারা

ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু খোকা সে মায়ায় ভোলেন নাই। যিনি স্বয়ং বিষ্ণু, রাক্ষসীর মায়া তাঁহার কাছে খাটিবে কেন! রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে খোকাকে দুধ খাইতে দিল, খোকা সেই দুধের সঙ্গে অভাগীর প্রাণ অবধি চুষিয়া লইল। তখন যে রাক্ষসী চ্যাচায়াইছিল, তেমন চিৎকার আর কেহ কোনদিন শুনে নাই। তাহারা সকলে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তখনই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল কী ভীষণ ব্যাপার, বিকট রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, তিনি গব্যূতি (৬ ক্রোশ) পরিমিত স্থানের গাছপালা তাহার দেহের চাপনে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাক্ষসীর এক একটা দাঁত যে এককেটি লাঙলের ফাল, নাকের ছিদ্র যেন পর্বতের গুহা, চোখ দুটো যেন দুটো কুয়া। সেই রাক্ষসীর বুকের উপর শুইয়া খোকা আনন্দে হাত পা ছুঁড়িতেছে। তখনই সকলে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল, আর ক্রমাগত ষাট্-ষাট্ বলিতে বলিতে কত দেবতার নাম যে করিল তাহার অন্তই নাই।

উহারা যদি জানিত যে সেই খোকাই রাক্ষসীটিকে মারিয়াছে, তবে না জানি কত আশ্চর্য হইত।

আর একদিন খোকাকে একটি গাড়ির নীচে, একটি ছোট্ট খাটে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। বোধহয় এইভাবে তাহাকে প্রায়ই শোয়াইয়া রাখা হইত। সেদিন বাড়িতে কিসের উৎসব ছিল, সকলে তাহাতেই মত্ত, খোকার কথা আর কাহারও মনে নাই; খোকার কিন্তু এদিকে বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, তাহার দরুন সে পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে একবার তাহার লাথি লাগিয়া হাঁড়ি কলসিতে বোঝাই সেই প্রকাণ্ড গাড়িখানা উল্টাইয়া গেল। সে সব হাঁড়ি কলসি তখনই খান খান হইয়া ভাঙিয়া গেল। আর শব্দও অবশ্য যেমন-তেমন হইল না। তাহা শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা চিত হইয়া শুইয়া পা ছুঁড়িতেছে। তাহার পাশে গাড়িখানা উল্টানো, আর হাঁড়ি কলসি চূর্ণ হইয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। এত বড় গাড়ি কি করিয়া উল্টাইল, একথা সকলেই তখন ব্যস্ত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেখানে আর কয়েকটি বালক ছিল তাহারা খোকাকে দেখাইয়া বলিল যে এই খোকা পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে গাড়ি উল্টাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি। শুনিয়া সকলে হাঁ করিয়া একবার খোকার দিকে একবার গাড়িখানার দিকে তাকাইতে লাগিল।

খোকাটি একটু বড় হইলে তাহার নাম 'কৃষ্ণ' রাখা হইল। রোহিণীর খোকার নাম 'বলরাম' তাহাও এই সময়ে রাখা হয়। কী দুরন্ত দুটি খোকাই তাহারা ছিল!

যখন কৃষ্ণ আর বলরাম একসঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে শিখিলেন, তখন হইতে আর এক মুহূর্তের জন্য কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার জো রহিল না। ছাই আর গোবর দেখিলেই দুটি খোকা অমনি তাহা লইয়া গায় মাখাইবে, যশোদার সাধ্য কি তাহাদিগকে বারণ করেন। একটু চোখের আড়াল হইলেই তাহারা গোয়াল-ঘরে ঢুকিয়া ছোট ছোট বাছুরগুলির লেজ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত। যশোদা

ইহাদের পিছু-পিছু ছুটাছুটি করিয়া নাকালের একশেষ হইতে লাগিলেন। শেষে একদিন তিনি আর কিছুতেই ইহাদিগকে সামলাইতে না পারিয়া রাগের ভারে বকিতে বকিতে লাঠি হাতে কৃষ্ণকে তাড়া করিলেন। তারপর তাহাকে ধরিয়া মোটা দড়ি দিয়া একটা উদূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া বলিলেন, 'পালা দেখি এখন!'

এই বলিয়া যশোদা নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজে গিয়াছেন, আর কৃষ্ণও অমনি উদূখল টানিয়া উঠান পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উদূখল টানিতে টানিতে তিনি দুটি অর্জুন গাছের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গাছ দুটি খুব কাছাকাছি থাকায় উদূখলটি সেখান দিয়া গলিতে না পারিয়া আটকাইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের টানাটানিতে সেই প্রকাণ্ড গাছ দুটি মহাশব্দে ভাঙিয়া পড়ায় সকলে ভাবিল না জানি কী হইয়াছে। তাহারা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা দুই গাছের মাঝখানে বসিয়া তাহার ছোট ছোট দাঁতকটি বাহির করিয়া হাসিয়া অস্থির, তাহার পেটের সঙ্গে দড়ি দিয়া উদূখল বাঁধা। সেই হইতে কৃষ্ণের একটি নাম হইল 'দামোদর', কি না, পেটে দড়ি (দাম = দড়ি, উদর = পেট)। যা হোক, সেই প্রকাণ্ড গাছ ভাঙা যে সেই খোকার কাজ এ কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। বুড়ারা বলিল, 'এখানে বড়ই উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে দেখিতেছি, গাড়ি উল্টাইয়া যায়, বিনা ঝড়ে গাছ ভাঙিয়া পড়ে। এখানে আর থাকা উচিত নয়। চল আমরা বৃন্দাবনে চলিয়া যাই।' এই বলিয়া তখনই সকলে গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেল।

ধ্রুব

সে যে কত কালের কথা, তাহা আমি জানি না। সেই অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। উত্তানপাদের দুই রানী ছিলেন, একটির নাম সুনীতি, আর একটির নাম সুরুচি।

সুনীতি বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন, কিন্তু সুরুচি ছিলেন ঠিক তাহার উল্টো। আর সুনীতিকে তিনি প্রাণ ভরিয়া হিংসা করিতেন। রাজা সেই সুরুচিকে এতই ভালবাসিতেন, যে উহার কথা না রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুরুচি তাঁহার নিকট সুনীতির নামে কত মিথ্যা কথাই বলিতেন, তিনি ভাবিতেন, তাহার সকলই বুঝি সত্য। শেষে রাজা একদিন সুরুচির কথায় সুনীতিকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

দুঃখিনী সুনীতি তখন আর কী করেন? মুনিদের তপোবনে গিয়া আশ্রয় লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর উপায় রহিল না। সেইখানে কয়েকদিন পরেই তাঁহার একটি খোকা হইল, তাহার নাম হইল ধ্রুব। তখন হইতে ধ্রুবকে লইয়া তিনি মুনিদের

আশ্রমেই থাকেন। খোকাটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। সে মুনিকুমারদের সঙ্গে খেলা করে, মুনিদের হোম তপস্যা দেখে আর তাঁহাদের মুখে ভগবানের নাম শুনে। এইরূপে শিশুকালেই তাহার প্রাণে ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মিল।

এমনি করিয়া দিন যায়। ক্রমে ধ্রুবের বয়স চারি-পাঁচ বৎসর হইয়াছে। ইহার মধ্যে সে একদিন শুনিল যে, সে রাজার পুত্র, মহারাজ উত্তানপাদ তাহার পিতা। একথা শুনিবামাত্র পিতাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। সে ভাবিল, 'আমি এখনই পিতাকে দেখিতে যাইব।'

রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সুরুচি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া সুরুচির পুত্র উত্তম রাজার কোলে। এমন সময় ধ্রুব সেখানে আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য তাহার ছোট হাত বাড়াইয়া দিল। রাজার হয়ত তাহাকে কোলে লইতে খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সুরুচির সাক্ষাতে তিনি ছেলেটিকে আদর দেখাইতে সাহস পাইলেন না। তখন সুরুচি বিষম ভ্রূকুটি করিয়া নিতান্ত কর্কশ-ভাবে ধ্রুবকে বলিলেন, 'ছেলের আস্পর্ধা দেখ ? এত কষ্ট কেন করিতেছিস বাছা ? জানিস না কি যে তুই সুনীতির ছেলে ? উনি তোর পিতা হইলে কি হয় ? আমি তো তোর মা নই। রাজাসনে বসা তোর কপালে নেই, সে শুধু আমার ছেলেরই জন্য।'

ধ্রুবের প্রাণে নিষ্ঠুর কথাগুলি বড়ই লাগিল। সে আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া, ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তাঁহার কাঁদ-কাঁদ মুখ আর ছল-ছল চোখ দুটি দেখিবামাত্র তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে বাবা ? কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে ?'

ধ্রুব কহিল, 'মা, আমি বাবার কোলে উঠিতে গিয়াছিলাম, সৎমা বলিলেন আমি তোমার ছেলে বলিয়া নাকি তাঁহার কোলে উঠিতে পাইব না ; রাজাসনে বসা আমার কপালে নাই।'

ধ্রুব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এই কথাগুলি বলিল ; তাহা শুনিয়া সুনীতির যে কী কষ্ট হইল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। তিনি কোনমতে চোখের জল থামাইয়া ধ্রুবকে বলিলেন, 'বাবা, সুরুচি সত্যিই বলিয়াছে তোমার কপাল মন্দ, তাই তুমি আমার মত অভাগিনীর পুত্র হইয়াছ। তোমার কপাল ভাল হইলে কেহ তোমাকে এমন কথা বলিতে পারিত না। রাজার আসনে বসা, ভাল ভাল হাতি ঘোড়ায় চড়া, এ সকল যাহার পুণ্য আছে তাহার ভাগ্যেই জোটে। সুরুচির ছেলে উত্তম অন্য জন্মে অনেক পুণ্য করিয়াছিল, তাই এখন সে রাজার কোলে বসিতে পায়। তুমি কর নাই, তাই তুমি তাঁহার কোলে বসিতে পাইলে না। সুরুচির কথায় যদি তোমার দুঃখ হইয়া থাকে, তবে যাহাতে তোমার পুণ্য হয় সেইরূপ কাজ কর, তাহা হইলেই তোমার কপাল ভাল হইয়া যাইবে।'

ধ্রুব কহিল, 'মা, আমার মনে যে বড়ই লাগিয়াছে, তোমার কথায় তো আমার

দুঃখ যাইতেছে না। আমি এমন কাজ করিব যাহাতে সকলের চেয়ে যে ভাল তাহার চেয়েও ভাল স্থান পাইতে পারি। তোমার ছেলে যে আমি, আমার তেজ তুমি দেখ। বাবার যাহা আছে সবই উত্তমের হউক, অন্যের দেওয়া আমি কিছু চাহি না। আমি নিজে এমন জায়গা দেখিয়া লইব যে, বাবাও তাহা পান নাই।'

এই বলিয়াই ধ্রুব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তারপর একমনে পথ চলিতে চলিতে সে বনের ভিতর এক স্থানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে সাতজন মুনি কুশাসনে বসিয়া আছেন। সে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, আমার মার নাম সুনীতি। আমি মনে বড় কষ্ট পাইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়াছি।' মুনিগণ বলিলেন, 'বাছা, তুমি চার-পাঁচ বছরের বালক, তোমার মনে আবার কী কষ্ট হইল ?' ধ্রুব কহিল, 'আমার বিমাতা আমাকে কটু কথা কহিয়াছেন, তাই আমার মনে কষ্ট হইয়াছে।'

ধ্রুবের নিকট সকল কথা শুনিয়া মুনিরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বাছা, এখন তুমি কী চাহ ? আমরা তোমার কী সাহায্য করিতে পারি ?' ধ্রুব কহিল, 'আমি সেই স্থান পাইতে চাই, যাহা অন্য কেহ পায় নাই। সে স্থান কী করিয়া পাইব আপনারা তাহা আমাকে বলিয়া দিন।' মুনিগণ বলিলেন, 'যিনি সকলের বড়, যাহা কিছু সকলই যাঁহার, তুমি সেই হরিকে ডাক, তাহা হইলে তুমি সে স্থান পাইবে।'

ধ্রুব কহিল, 'কী করিয়া ডাকিলে তিনি খুশি হইবেন তাহা তো আমি জানি না, তাহা বলিয়া দিন।' মুনিরা বলিলেন, 'আর কিছুরই কথা ভাবিবে না কেবলই তাঁহার কথা ভাবিবে, আর শুধু বলিবে, "তুমি সকলের, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না, তুমি সকলই জান, তোমাকে নমস্কার।" ইহাতেই তিনি তুষ্ট হইবেন। তোমার পিতামহ মনু এইরূপেই তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন।'

তখন ধ্রুব সেই মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া মনের আনন্দে সেখান হইতে যমুনার তীরে মধুবন নামক বনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে দিনরাত একমনে এমনি ব্যাকুলভাবে হরিনাম করিতে লাগিল যে, আর কেহ কখনও তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে নাই। সে আশ্চর্য তপস্যা দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইলেন, পৃথিবী কাঁপিল, সাগর উছলিয়া উঠিল।

ইন্দ্র ভাবিলেন, না জানি এই বালক এমন তপস্যা করিয়া কী বিপদ ঘটাইবে! তখন তিনি আর কতগুলি দেবতার সহিত মিলিয়া ধ্রুবের তপস্যা ভাঙিবার আয়োজন করিলেন। দেবতা সুনীতির বেশে 'হায় বাছা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ধ্রুবকে বলিল, 'বাবা, কত আশা করিয়া আমি তোমাকে পাইয়াছি। দুঃখিনীর ধন, আমার যে বাছা আর কেহ নাই, আমাকে এমনি করিয়া ফেলিয়া আসিতে হয় ? তুমি যদি তপস্যা না ছাড়, তবে আমি তোমার সম্মুখে মরিয়া যাইব।'

কিন্তু ধ্রুবের মন তখন হরির ধ্যানেই মজিয়া ছিল, সে-সকল কপট কান্না শুনিয়াও শুনিল না। তখন সেই দুষ্ট দেবতারা 'বাবা গো! কী ভয়নাক রাক্ষস

আসিয়াছে ! পালাও পালাও,' বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল ।

অমনি কোথা হইতে ভীষণ রাক্ষসগণ দলে দলে 'মার মার', 'কাট কাট' শব্দে ধ্রুবকে খাইতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শত-শত শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। রাক্ষসেরাও তাহাদের সিংহের মত, উটের মত, কুমিরের মত মুখ দিয়া আগুন ফুঁকিতে ফুঁকিতে কতই গর্জন করিল, শেল, শূল, মুদ্গর কতই ঘুরাইল, আর দাঁত খিঁচাইল। ধ্রুব তাহা টের পাইল না ।

এইরূপে যখন ধ্রুবের তপস্যা ভাঙিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, তখন দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীহরির নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হে প্রভু, আমাদিগকে রক্ষা করুন। উত্তানপাদের পুত্র অতি ভীষণ তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, না জানি আমাদের কাহার কাজটি কাড়িয়া নিবে ! শীঘ্র উহার তপস্যা থামাইয়া দিন !'

শ্রীহরি বলিলেন, 'তোমাদের কোন ভয় নাই ! ধ্রুব কী চাহে, আমি তাহা জানি। তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আমি তাহার তপস্যা শেষ করিয়া দিতেছি।' তারপর তিনি সেই মধুবন আলো করিয়া ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ধ্রুব ! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি, তুমি কী চাহ ?'

তখন ধ্রুব চক্ষু মেলিয়া সেই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল, ভয়ও পাইল। সে তাঁহার পায় লুটাইয়া বলিল, 'আমি তো জানি না কী করিয়া আপনার স্তব করিতে হয়, আমাকে তাহা শিখাইয়া দিন।' বলিতে বলিতে শ্রীহরির কৃপায় তাহার জ্ঞান হইল। তখন সে প্রাণ ভরিয়া অতি মধুর বাক্যে শ্রীহরির স্তব করিতে করিতে বলিল, 'বিমাতা আমাকে ধমকাইয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার পুত্র নহি বলিয়া আমি রাজাসনে বসিতে পাইব না। হে প্রভু, আমি আপনার নিকট এমন স্থান চাই যে তাহা সংসারের সকল স্থানের চেয়ে ভাল।' শ্রীহরি বলিলেন, 'ধ্রুব, তুমি তাহাই পাইবে। চন্দ্র, সূর্য, রবি, বৃহস্পতি সকলের উপরে তোমার স্থান হইল। তোমার মাতাও তারা হইয়া তোমাদের নিকটে থাকিবেন।'

সেই অবধি শ্রীহরির বরে ধ্রুব আকাশে ধ্রুবতারা হইয়া সংসারচক্র ঘুরাইতেছে এইরূপ আমাদের পুরাণে লেখা।

স্যমন্তক মণি

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল প্রসেন। প্রসেনের ভ্রাতার নাম ছিল সত্রাজিৎ। সূর্যের সহিত সত্রাজিতের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

একদিন সত্রাজিৎ তোয়কূল নামক নদীতে নামিয়া সূর্যের উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় সূর্য স্নেহবশত নিজেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্রাজিৎ সূর্যের সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, 'ভগবান, আকাশে আপনাকে যেমন উজ্জ্বল দেখি, এখন তেমনি উজ্জ্বল দেখিতেছি। আপনি যে স্নেহ করিয়া আমার নিকট আসিলেন, তাহার দরুন তো আপনার রূপ কিছুমাত্র কোমল হয় নাই।'

সূর্য তখন একটু হাসিয়া নিজের কণ্ঠ হইতে একটি মণি খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তখন দেখা গেল যে তাহার মূর্তি অতি সুন্দর এবং স্নিগ্ধ।

সেই যে মণি, উহারই তেজে সূর্যকে এত উজ্জ্বল দেখা গিয়াছিল। সে মণির নাম স্যমন্তক। উহার এতই গুণ যে, যাহার গৃহে উহা থাকে, তাহার কোন অসুখ বা অকল্যাণ হয় না। যে দেশে উহা থাকে তথা হইতে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সকল উৎপাত দূর হইয়া যায়।

সেই মণিটি সত্রাজিতের বড়ই ভাল লাগিল, সুতরাং সূর্য যাইবার সময় তিনি তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন যে, 'হে প্রভো! আপনি তো আমাকে কতই স্নেহ করেন, দয়া করিয়া এই মণিটি আমাকে দিয়া যান।'

সে কথায় সূর্য তখনই তাঁহাকে মণিটি দিয়া গেলেন।

এই মণি লইয়া সত্রাজিৎ যখনই নিজের নগরে ফিরিলেন, তখন নগরের সমস্ত লোক নিতান্ত ব্যস্তভাবে 'ঐ সূর্য যাইতেছেন!' 'ঐ সূর্য যাইতেছেন!' বলিয়া তাঁহার পিছুপিছু ছুটিল। সে আশ্চর্য মণি যে দেখে সে-ই হতবাক হইয়া যায়। তাহার গুণের কথা যে শোনে, সে-ই ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসে।

সেই মণি পাইবার জন্য কৃষ্ণের খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, সত্রাজিৎ তাঁহাকে তাহা দেন নাই। কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে উহা সত্রাজিতের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মতন মহৎ লোকে এমন কাজ কেন করিবেন?

সত্রাজিৎ সেই মণি তাঁহার ভাই প্রসেনকে দেন। প্রসেন প্রায়ই উহা পরিয়া চলাফেরা করিতেন। একদিন সেই মণি গলায় পরিয়া তিনি বনের ভিতর শিকার করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ভয়ঙ্কর এক সিংহ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই ভীষণ সিংহের হাত হইতে আর তিনি রক্ষা পাইলেন না।

কিন্তু, কী আশ্চর্য! সিংহ যে প্রসেনকে হত্যা করিল, সে তাঁহাকে খাইবার

জন্য নহে, তাঁহার ঐ মণিটি পাইবার জন্য। সে তাঁহাকে মারিয়া মণিটি লইয়া চলিয়া গেল, তাঁহার দেহের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

যে বস্তুর প্রতি এক জন্তুর লোভ হয়, অন্য জন্তুরও তাহার প্রতি লোভ হইতে পারে। সিংহ সেই মণি লইয়া বেশি দূর যাইতে না যাইতেই পর্বতের গুহার ভিতর হইতে এক বিশাল ভল্লুক আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙিয়া মণিটি কাড়িয়া নিল।

প্রসেন যখন আর ঘরে ফিরিলেন না, তখন তাঁহার আত্মীয়েরা মনে করিল যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সেই মণির লোভে তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, নহিলে এমন কাজ আর কে করিবে? পূর্ব হইতেই কৃষ্ণের ঐ মণির প্রতি লোভ ছিল, তাঁহারই এই কাজ।

বাস্তবিক এ বিষয়ে কৃষ্ণের কোন অপরাধই ছিল না, কাজেই এই মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। আর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়াই হউক, এই মণি আনিয়া দিতে হইবে।

প্রসেন যখন শিকারে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে সেই শিকারের জায়গায় গিয়াই তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে! কৃষ্ণ ও বলরাম কয়েকটি সাহসী, চতুর আর বিশ্বাসী লোক লইয়া চুপিচুপি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া প্রসেনের দেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইল না। প্রসেনের ঘোড়াটিও সেইখানে মরিয়া পড়িয়া ছিল। দুটি দেহের চারিধারে সিংহের পায়ের দাগ, সিংহের নখ-দাঁতে দেহ দুটি ক্ষত-বিক্ষত।

সেই সিংহের পদচিহ্ন ধরিয়া কিছুদূর গেলেই দেখা গেল যে উহার দেহও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে যে ভল্লুকে মারিয়াছে, পায়ে চিহ্ন দেখিয়া আর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। এখন এই ভল্লুককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই হয়। তাঁহারা অতি সাবধানে সেই ভল্লুকের পায়ের দাগ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। সে দাগ ক্রমে একটা গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল, সেই গুহার ভিতরেই ভল্লুকের বাড়ি।

এই কথার আরো প্রমাণ তখনই পাওয়া গেল। গুহার ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোকের গলার শব্দ আসিতেছে, একটি ছেলেরও কান্না শুনা যাইতেছে। স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে বলিতেছে, 'কাঁদিও না বাছা! সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছিল, তোমার পিতা সেই সিংহকে মারিয়া স্যমন্তক মণি আনিয়াছেন। এখন সেই মণি লইয়া তুমি খেলা করিবে, আর কাঁদিও না।'

কাজেই আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন কৃষ্ণ বলরাম আর সঙ্গের লোকদিগকে গুহার দরজায় রাখিয়া যেই একা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি পর্বতপ্রমাণ এক বিশাল, বিরাট ভল্লুক ভীষণ গর্জনে পাহাড় কাঁপাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন যে তাঁহাদের কী ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন, দুদিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল, তবু সে যুদ্ধের বিরাম নাই।

এদিকে কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া আর ভল্লুকের গর্জন শুনিয়া বলরাম আর সঙ্গের লোকেরা দ্বারকায় আসিয়া সকলকে বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ আর নাই, তাঁহাকে ভল্লুকে খাইয়াছে।

একুশ দিনের পর সেই যুদ্ধ শেষ হইল। একুশ দিন যুদ্ধ করিয়া ভল্লুক বুঝিতে পারিল যে কৃষ্ণের নিকট হার মানা ভিন্ন আর উপায় নাই। তখন সে অশেষ অনুনয়ের সহিত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তারপর সে যেই জানিল যে তিনি এই মণির জন্য আসিয়াছেন, অমনি মণি তো তাঁহাকে দিলই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের কন্যাটিও দান করিল।

কৃষ্ণ সেই মণি আর কন্যা লইয়া মনের সুখে দ্বারকায় চলিয়া আসিলেন। লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কী বলিল তাহা আমি জানি না, তবে সত্রাজিৎ যে মণি পাইয়া খুবই খুশি হইয়াছিলেন, এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

সেই ভল্লুকটি যে-সে ভল্লুক ছিল না। সে সেই জাম্ববান, রামায়ণে যাহার কথা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ। আর তাহার মেয়েটির নাম ছিল জাম্ববতী। সেও কি ভল্লুক ছিল?

সাপ রাজপুত্র

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শূরসেন। রাজার পুত্র না থাকায় তাঁহার মনে বড়ই দুঃখ ছিল। সেই দুঃখ দূর করার জন্য তিনি অনেক দান-ধ্যান, অনেক যাগযজ্ঞ করিলেন। তাহার ফলে শেষে তাঁহার একটি পুত্র হইল বটে, কিন্তু সে সাধারণ লোকের ছেলেপিলের মতন নহে। সে একটি ভীষণ সর্প। যদিও মানুষের মতন কথা কয়।

রাজা মনের দুঃখে বলিলেন, 'হায় হায়! এই সর্প লইয়া আমি কী করিব? ইহার চেয়ে যে পুত্র না হওয়া আমার অনেক ভাল ছিল।'

কিন্তু সাপ সে কথা ভাবিলই না, সে রাজাকে বলিল, 'বাবা, আমার চূড়াকরণ উপনয়ন করাইলে না? আমার হাতে-খড়ি দিলে না? তাহা হইলে যে আমি মূর্খ থাকিয়া যাইব!'

রাজা আর কী করেন? তিনি ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সব করাইলেন। সেই সাপ তখন দেখিতে দেখিতে সকল শাস্ত্র শেষ করিয়া মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিল। তারপর একদিন সে রাজাকে বলিল, 'বাবা, আমার বিবাহ দিলে না? তাহা হইলে যে লোকে আমাকে ছেলেমানুষ ভাবিবে, আমার কথা গ্রাহ্য করিবে না! আর তোমারও বংশ লোপ পাইয়া যাইবে, তাহার দরুন শেষে তোমাকে নরকে যাইতে হইবে!'

রাজার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, 'বাছা, তুমি যদি মানুষ হইতে তবে তো কোন মুশকিল ছিল না, কিন্তু তুমি যে সাপ, তোমাকে দেখিলে পালোয়ানেরাও ছুটিয়া পালায়। তোমাকে কে তাহার মেয়ে দিতে চাহিবে বল?'

সাপ বলিল, 'নাই বা চাহিল। রাজাদের তো জোর করিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ হইতে পারে,—তাই কেন কর না? আমার যদি বিবাহ না হয়, তবে আমি নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব!'

এ কথায় রাজামহাশয় তো বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন।

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাঁহার অমাত্যদিগকে বলিলেন, 'আমার পুত্র এখন বড় হইয়াছে, আর খুব উপযুক্তও বটে। তোমরা তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখ।'

রাজার যে একটি ছেলে আছে, অমাত্যরা সকলেই তাহা জানে কিন্তু সেটা যে একটি সাপ, সে কথা তাহাদের কেহই জানে না। সে কথাটা রাজা মহাশয় গোপন রাখিয়াছিলেন। কাজেই রাজার কথা শুনিয়া তাহারা খুব উৎসাহের সহিত বলিল, 'মহারাজ! আপনার যখন ছেলে তখন আর চেষ্টায় বিশেষ দরকার কী? দেশ-বিদেশে আপনার নাম; আপনি যাহার নিকট চাহিবেন, সে-ই মেয়ে দিবে।'

রাজার একটি খুব পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী ছিল, কিন্তু সে রাজার কথার ভাবে বুঝিয়া লইল যে ইহার মধ্যে কিছু চেষ্টার দরকার আছে। সে বলিল, 'মহারাজ! আপনার অনুমতি হইলে আমি কন্যার চেষ্টায় যাইতে পারি। পূর্বদেশে বিজয় নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার রাজ্য ধন লোকজন হাতি ঘোড়ার সীমা নাই। তাঁহার আটটি মহাবল পুত্র আর ভোগবতী নামে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত একটি কন্যা আছেন। সেই কন্যাই আপনার পুত্রবধূ হইবার উপযুক্ত।'

সেই কথায় রাজা ভারি খুশি হইয়া তখনই বিস্তর টাকাকড়ি ও লোকজন সঙ্গে দিয়া কর্মচারীটিকে পূর্বদেশে রওনা করিয়া দিলেন। কর্মচারী রাজা বিজয়ের সভায় উপস্থিত হইয়া শূরসেনের পুত্রের জন্য তাঁহার কন্যা ভোগবতীকে প্রার্থনা করিল। সেই সাপকে সে জন্মেও চোখে দেখে নাই, জানে না যে সেটা সাপ। সে তাহাকে মানুষ ভাবিয়া আন্দাজে তাহার কত প্রশংসাই যে করিল, তাহা আর বলিবার নয়। তাহার একটি কথাও সত্য নহে। কিন্তু রাজা বিজয় তাহার আগাগোড়াই বিশ্বাস করিলেন, কাজেই বিবাহের কথা স্থির হইতে আর বিলম্ব হইল না। তারপর আর দু-একবার আসা-যাওয়া করিতেই বিজয় এ কথায়ও রাজী হইলেন যে, বর বিবাহ করিতে আসিবেন না, নিজের অস্ত্র পাঠাইয়া দিবেন, তাহার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হইবে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এরূপ ঘটনা ঢের হইয়া থাকে, কাজেই তেমনি করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই ভোগবতীর বিবাহ হইয়া গেল। কেহই জানিল না যে, সে বিবাহ একটা সাপের সঙ্গে হইয়াছে; ভোগবতীও তাহা জানিল না।

সে শ্বশুর-বাড়ি গেলে পর প্রথমে কেহই তাহাকে সেই সাপের কথা জানাইতে

সাহস পায় নাই। কিন্তু শেষে যখন সে সকল কথা জানিল, আর সাপকে দেখিল, তখন সেই সাপকেই তাহার যারপরনাই ভাল লাগিল। সে দিনরাত পরম যত্নে তাহার সেবা করে, অতি মিষ্টভাবে তাহার সঙ্গে কথাবার্তা কহে, আর গান গাহিয়া, বাজনা বাজাইয়া খেলা করিয়া বিধিমতে খুশি রাখে!

তখন একদিন সাপ তাহাকে বলিল, 'ভোগবতী, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, পূর্বের কথা এখন আমার মনে হইতেছে। আমি অনন্তের পুত্র মহাবল নাগ, মহাদেবের হাতে আমি থাকিতাম। তখনও তুমি আমার স্ত্রী ছিলে। একদিন শিব আমার উপর চটিয়া আমাকে এই শাপ দেন যে, "তোমাকে মানুষের ঘরে সাপ হইয়া জন্মাইতে হইবে।" তখন তুমি আর আমি দুইজনে মিলিয়া শিবকে মিনতি করায় তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা দুজনে যখন গোতমী নদীতে গিয়া আমার পূজা করিবে, তখন তোমাদের শাপ কাটিয়া যাইবে।" এখন তুমি আমাকে গোতমী নদীতে লইয়া চল।'

ভোগবতী তখন তাহাকে লইয়া গোতমীতে যাত্রা করিল, আর সেখানে গিয়া শিবের পূজা করিতেই সেই সাপের আবার দেবতার মত সুন্দর চেহারা হইল।

তখন সে শূরসেনের নিকট গিয়া বলিল, 'বাবা, এখন আমার পৃথিবীর প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, অনুমতি করুন আমি শিবের নিকট যাই।'

শূরসেন বলিলেন, 'বাবা, তুমি হইলে যুবরাজ, কিছুদিন এখানে থাকিয়া রাজ্য ভোগ কর, তোমার ছেলেপিলে হউক, আমরা দেখিয়া চক্ষু জুড়াই। তারপর আমার মৃত্যু হইলে শেষে শিবের নিকট যাইও।'

সে কথায় সম্মত হইয়া মহাবল সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল।

প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য

তমসা নদীর ধারে বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল। দু-ধারে গভীর বন, তাহার মাঝখান দিয়া সুন্দর ছোট নদীটি কুল-কুল করিয়া বহিতেছে। তাহার জল এতই পরিষ্কার যে তলার বালি অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একটু কাদা নাই, একগাছিও শ্যাওলা নাই। কাঁচের মত টলটল করিতেছে। বাল্মীকি নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলেন, আর সেই নির্মল জল দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই সুখ হইল। সঙ্গে তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজ ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বলিলেন, 'দেখ ভরদ্বাজ, নদীর জল কী নির্মল, যেন সাধু লোকের মন। আমার বল্কল দাও, আমি এইখানে স্নান করিব।'

সেইখানে দুটি বক নদীর ধারে খেলা করিতেছিল। এমন সুন্দর দুটি পাখি এবং তাহাদের এমন মিষ্ট ডাক, আর তাহারা মনের আনন্দে এমনি চমৎকার খেলা

করিতেছিল যে, দেখিয়া মুনি আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। পাখি দুটির উপর মুনির কেমন স্নেহ জন্মিয়া গেল, তিনি স্নানের কথা ভুলিয়া কেবলই তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে এক দুষ্ট ব্যাধ আসিয়া পাখি দুটির পানে তীর ছুঁড়িয়া মারিল। এমন সুখে পাখি দুটি খেলা করিতেছিল, তাহাদের কোন দোষ ছিল না, কোন বিপদের কথা তাহারা জানিত না। এমন নিরীহ জীবকে বধ করে নিষ্ঠুর লোক হয় ? তীর খাইয়া পুরুষ পাখিটি যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল, মেয়েটি শোকে আর ভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইল।

মুনি আর এ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ব্যাধকে বলিলেন, 'ওরে ব্যাধ, এমন সুখে পাখিটি খেলা করিতেছিল, তাহাকে তুই বধ করিলি ? তোর কখনই ভাল হইবে না।'

দয়ালু মুনির মনের দুঃখ তাঁহার চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল।

সেই কথায় আপনা হইতেই ছন্দ আসিয়া তাহা কবিতা হইয়া গেল। সেই কবিতাই সকলের প্রথম কবিতা, তাহার পূর্বে কেহ কবিতা রচনা করে নাই।

মুনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'এ কী চমৎকার কথা আমি বলিলাম ! আমি কিছুই জানি না, তবু ইহাতে বীণার ছন্দের মত কেমন সুন্দর ছন্দ হইল ! ইহার চারিভাগে সমান সমান অক্ষর হইল। আমি বলি ইহার নাম শ্লোক হউক, কেননা আমার শোকের সময় ইহা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।'

ভরদ্বাজও বলিলেন, 'গুরুদেব ! কী সুন্দর কথা ! এমন কথা তো কেহ আর কখনো বলে নাই। ইহার নাম শ্লোকই হউক।'

তারপর মুনি স্নান করিয়া ঘরে আসিয়া সেই সুন্দর সুন্দর ছন্দের কথা ভাবিতেছেন এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাখি দুইটির দুঃখে কাতর হইয়া মুনি আর ব্রহ্মাকে অন্য কথা বলিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহাকে সেই দুষ্ট ব্যাধের কথা বলিয়া সেই কবিতাটি গাহিয়া শুনাইলেন।

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'বাল্মীকি, তোমার এ কবিতার নাম শ্লোকই হউক। এইরূপ শ্লোক লিখিয়া তুমি রামের বৃত্তান্ত রচনা কর। সে বড় সুন্দর কাহিনী, তাহা যে পড়িবে তাহারই মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা লিখিবে তাহার একটি কথাও মিথ্যা হইবে না। যতদিন পৃথিবীতে পর্বত আর নদীসকল থাকিবে, ততদিন লোকে তোমার রামায়ণের আদর করিবে ; আর যতদিন রামায়ণের আদর থাকিবে তুমি স্বর্গে গিয়া ততদিন অমরলোকে থাকিতে পাইবে।'

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলে, তাঁহার কথাগুলি মনে করিয়া বাল্মীকি ঠিক করিলেন, 'এইরূপ মিষ্ট শ্লোক দিয়া আমি রামায়ণ রচনা করিব।'

তারপর সেই ধার্মিক মুনি কুশাসনে বসিয়া জোড় হাতে ভগবানকে স্মরণপূর্বক রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রামায়ণ শেষ হইল। তখন মুনি ভাবি-

লেন, 'কাব্য তো শেষ হইল, এখন ইহা গাহিবে কে ?'

ঠিক সেই সময়ে 'কুশী', 'লব' দুই ভাই আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দুটি ভাই রামেরই পুত্র, মুনির বেশে সেই আশ্রমে থাকিয়া লেখাপড়া শেখেন। দেবতার মতন সুন্দর ; গন্ধর্বের মতন মিষ্ট গান গাহেন।

মুনি বলিলেন, 'এরাই আমার রামায়ণের উপযুক্ত গায়ক।'

সেই দুটি ভাইকে সময়ে যত্নের সহিত মুনি রামায়ণ শিক্ষা দিলেন। তারপর একদিন সকল মুনিকে ডাকিয়া সেই রামায়ণের গান শোনানো হইল। মুনিরা মোহিত হইয়া সে গান শুনিলেন, তাঁহাদের চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল, আর মুখ দিয়া ক্রমাগত কেবল, 'আহা'! 'আহা'! এই শব্দ বাহির হইতে লাগিল। শেষে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একজন মুনি তাঁহার নিকটে যাহা কিছু ছিল সকলই কুশী-লবকে দিয়া দিলেন। অন্যেরা কেহ বল্কল, কেহ হরিণের ছাল, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কৌপীন দিলেন। একজন মুনি কাঠ আনিতে চাহিয়াছিলেন, সে কাঠ বাঁধিবার দড়িগাছা ভিন্ন তাহার নিকটে আর কিছুই ছিল না, তিনি সেই দড়িগাছিই কুশী-লবকে দিয়া বারবার আশীর্বাদ করিলেন।

শব্দবেধী

জন্তুকে না দেখিয়া কেবলমাত্র তাহার শব্দ শুনিয়াই যে তাহাকে তীর দিয়া বিঁধিতে পারে, তাহাকে বলে 'শব্দবেধী'।

রাজা দশরথ একরূপ 'শব্দবেধী' ছিলেন। যুবা বয়সে অনেক সময় তিনি রাত্রিতে বনে গিয়া এইরূপে কত হাতি, মহিষ, হরিণ শিকার করিতেন। বর্ষার রাত্রে তীরধনুক লইয়া চুপিচুপি সরযূর ধারে বসিয়া থাকিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। নদীর ঘাটে নানারূপ জন্তু জল খাইতে আসিত ; সেই জলপানের শব্দ একটিবার দশরথের কানে গেলে আর সে জন্তুকে ঘরে ফিরিতে হইত না।

একবার এইরূপ বর্ষার রাত্রিতে দশরথ সরযূর ধারে তীর ধনুক লইয়া বসিয়া আছেন, মনে আর কোন চিন্তা নাই, খালি কান পাতিয়া রহিয়াছেন, কখন কোন জানোয়ারের শব্দ শোনা যাইবে। প্রায় সমস্ত রাত্রি এইভাবেই কাটিয়া গিয়াছে, ভোর হইতে আর বেশি বাকি নাই। এমন সময় নদীর ঘাট হইতে 'গুড়-গুড়-গুড়' করিয়া একটা আওয়াজ আসিল।

দশরথ চমকিয়া ভাবিলেন, 'ঐ হাতি!' আর সেই মুহূর্তেই সেই শব্দের দিকে একটি ভয়ঙ্কর বাণ শন-শন শব্দে ছুটিয়া চলিল।

দশরথ জানেন না যে সে বাণে কী সর্বনাশ হইবে। সে শব্দ তো হাতির শব্দ নয়, ঋষির পুত্র ভোরবেলায় কলসী হাতে ঘাট হইতে জল নিতে আসিয়াছেন, সেই

কলসীতে জল পোরার ঐ শব্দ।

অন্ধ পিতা-মাতা বিছানায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন ; তাঁহারা যারপরনাই বুড়া, তাহাতে আবার নিতান্ত দুর্বল, চলিবার শক্তি নাই। পিপাসায় তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাই ছেলেটি জল লইতে আসিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে এই নিদারুণ বাণ আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিল ! রক্তে দেহ ভাসিয়া গেল, কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল।

ঋষিপুত্র ধূলায় পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে বলিলেন, 'আহা ! আমি তো কাহারও কোন অনিষ্ট করি না ! বনে থাকি, ফলমূল খাই আর বৃদ্ধ অন্ধ পিতা-মাতার সেবা করি। ওগো ! আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছিলাম যে এমন নিষ্ঠুর সাজা আমাকে দিলে ? হায় ! হায় ! আমার পিতামাতাকে দেখিবার আর কেহই নাই ! আমি মরিলে যে আর তাঁহারা কিছুতেই বাঁচিবেন না !'

ঋষিপুত্রের কথা শুনিয়া দশরথের হাত হইতে ধনুর্বাণ পড়িয়া গেল। তিনি দুঃখে অস্থির হইয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন কী সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

তখন ঋষিপুত্র অতি কষ্টে তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ ! আমার কী অপরাধ ছিল ? এই এক বাণে আমারও প্রাণ গেল, আমার পিতামাতারও প্রাণ গেল। আহা ! মা আর বাবা পিপাসায় কাতর হইয়া পথ চাহিয়া আছেন, আমি গেলে জল খাইতে পাইবেন।'

দুঃখে দশরথের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি নাই। তাহা দেখিয়া সেই যাতনার মধ্যেও ঋষিপুত্রেরও দয়া হইল ; তিনি বলিলেন, 'মহারাজ ! আর এখানে বিলম্ব করিবেন না। এই সরু পথে আদের কুটিরে যাওয়া যায়। শীঘ্র গিয়া আমার পিতাকে এই সংবাদ দিন, আর তাঁহার রাগ দূর করুন, নহিলে তিনি আপনাকে ভয়ঙ্কর শাপ দিবেন। আর এই বাণ যে আমার বুকে বিঁধিয়া রহিয়াছে, ইহার যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, শীঘ্র এটাকে তুলিয়া দিন।'

দশরথ ভাবিলেন, 'হায় ! আমি এখন কী করি ? বাণ না তুলিলে ইহার যন্ত্রণা যাইবে না, কিন্তু বাণ তুলিলেই ইঁহার মৃত্যু হইবে।'

তখন ঋষিপুত্র বলিলেন, 'আপনার ব্রাহ্মণ-বধের পাপ হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমার পিতা বৈশ্য, মা শূদ্রের মেয়ে।'

এ কথায় দশরথ ঋষিপুত্রের বুক হইতে বাণ টানিয়া বাহির করিলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটির প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন সেই কলসী ভরিয়া জল লইয়া দশরথ নিতান্ত দুঃখিত মনে ধীরে ধীরে কুটিরের দিকে চলিলেন। সেখানে অন্ধ মুনি আর তাঁহার অন্ধ পত্নী পিপাসায় কাতর হইয়া পুত্রের আশায় বসিয়া আছেন। দশরথের পায়ের শব্দ শুনিয়া মুনি বলিলেন, 'বাবা, এত বিলম্ব কেন হইল ? তোমার জন্যে তোমার মা বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, শীঘ্র ঘরে আইস !

তুমি কি রাগ করিয়াছ বাবা ? আমাদের যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা তোমার মনে করা উচিত নয়। তুমি কথা কহিতেছ না কেন ?'

দশরথের চোখ জলে ভরিয়া গেল। তিনি অনেক কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ভগবান, আমি আপনার পুত্র নহি। আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম দশরথ। আজ এই অভাগার বাণে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আমি জন্তু মারিবার জন্য সরযূর ধারে বসিয়াছিলাম। আপনার পুত্রের কলসীতে জল ভরার শব্দ শুনিয়া মনে করিলাম বুঝি হাতির শব্দ। অন্ধকারের ভিতরে সেই শব্দের দিকে বাণ ছুঁড়িলাম, তাহাতে এই সর্বনাশ হইল। এখন এই পাপীর প্রতি আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।'

এই বলিয়া দশরথ ছলছল চোখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মুনি এই দারুণ সংবাদ শুনিয়াও সাধারণ লোকের মত ব্যস্ত হইলেন না, রাজাকে কোন কঠিন শাপও দিলেন না। তিনি কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! তুমি না জানিয়া এ কাজ করিয়াছ, তাই রক্ষা পাইলে, নহিলে আজ তোমার বংশ-সুদ্ধ নষ্ট হইত। এখন এক কাজ কর, আমরা আমাদের পুত্রের নিকট যাইতে চাহি, একটিবার আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল।'

রাজা তখনই তাঁহাদের দুইজনকে সরযূর ধারে লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের চক্ষু নাই, সুতরাং জন্মের মত একটিবার পুত্রের মুখ দেখিবার উপায় নাই। তাঁহারা কেবল তাঁহার দেহের উপর পড়িয়া বার বার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তারপর চিতা প্রস্তুত করিয়া সেই দেহ পোড়ানো হইল।

তখন অন্ধ মুনি নিতান্ত দুঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! পুত্রের শোকে আমি যেমন দুঃখ পাইতেছি, তোমাকেও এইরূপ পুত্রশোক পাইতে হইবে।'

এই বলিয়া তাঁহারা দুইজনে সেই চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন আর দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের শরীর ভস্ম হইয়া গেল।

ইহার অনেক বৎসর পরে বৃদ্ধ বয়সে, কৈকেয়ীর ছলনায় দশরথ রামকে বনে দেন, আর সেই রামের শোকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন অন্ধ মুনির সেই কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

'পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি॥'

হনুমানের বাল্যকাল

হনুমানের মায়ের নাম ছিল অঞ্জনা। বানরের স্বভাব যেমন হইয়া থাকে, অঞ্জনার স্বভাবও ছিল তেমনই। হনুমান কাঁচ খোকা, তাহাকে ফেলিয়া সে বনের ভিতরে গেল, ফল খাইতে। বনে গিয়া সে মনের সুখে গাছে গাছে ফল খাইয়া বেড়াইতেই লাগিল, এদিকে খোকা বেচারা যে ক্ষুধায় চ্যাঁচাইতেছে, সেকথা তাহার মনেই হইল না।

হনুমান বেচারা তখন আর কী করে? চ্যাঁচাইয়া সারা হইল, তবু মার দেখা নাই, কাজেই তাহার নিজেকেই কিছু খাবারের চেষ্টা দেখিতে হইল। সেটা ছিল ভোরের বেলা, টুকটুকে লাল সূর্যটি তখন সবে বনের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে। সেই টুকটুকে সূর্য দেখিয়াই ভাবিল ওটা একটা ফল। অমনি আর কথাবার্তা নাই, সেই একলাফে আকাশে উঠিয়া ভয়ানক শোঁ শোঁ শব্দে সেই ফল পাড়িয়া খাইতে ছুটিল।

তোমরা আশ্চর্য হইও না। হনুমান তখন কাঁচ খোকা বটে, কিন্তু সে যে-সে খোকা ছিল না সেকথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেই শিশুকালেই তাহার বিশাল দেহ ছিল, আর গায়ের রঙ ছিল সেই ভোরবেলার সূর্যের মতই ঝকঝকে লাল। দেব দানব যক্ষ সকলেই তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অবাক না হইবেই বা কেন? সেই খোকা এমন ভয়ঙ্কর ছুটিয়া চলিয়াছে যে, তেমন বেগে ছুটিতে গরুড়ও পারে না, ঝড়ও পারে না। সকলে বলিল, 'শিশুকালেই এমন, বড় হইলে না জানি এ কেমন হইবে!'

এদিকে হনুমান গিয়া তো সূর্যের কাছে পোঁছিয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে আর এক ব্যাপার উপস্থিত। সেদিন ছিল গ্রহণের দিন, রাহু বেচারা অনেক দিনের উপবাসের পর সেইদিন সূর্যকে গিলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে হনুমানকে দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে অমনি 'বাবা গো!' বলিয়া দে ছুট। ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ইন্দ্রের সভায় গিয়া উপস্থিত।

ইন্দ্রের কাছে গিয়া নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিল, 'আপনারই হুকুমে আমি সূর্যটাকে গিলিয়া ক্ষুধা দূর করি; এখন আবার সেই সূর্যটা কাহাকে দিয়া ফেলিয়াছেন? আজ তো দেখিতেছি আর একটা রাহু তাহাকে গিলিতে আসিয়াছে!'

এ কথায় ইন্দ্র যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া তখনই ঐরাবতে চড়িয়া দেখিতে চলিলেন, ব্যাপারটা কী। রাহু তাঁহার আগে ছুটিয়া আবার সূর্যের নিকট গিয়াছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে টিকিতে পারে নাই।

রাহুর কিনা দেহ নাই, শুধুই একটি গোল মাথা, কাজেই হনুমান তাহাকে দেখিবামাত্র ফল মনে করিয়া ধরিতে আসিল। রাহু তখন 'ইন্দ্র! 'ইন্দ্র!' করিয়া চ্যাঁচাইয়া অস্থির। ইন্দ্র বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি এটাকে এখনই মারিয়া ফেলিতেছি।'

তখন হনুমান তাড়াতাড়ি ইন্দ্রের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই ঐরাবতের প্রকাণ্ড সাদা মাথাটা তাহার চোখে পড়িল। সে ভাবিল, এটাও বুঝি একটা ফল। এই ভাবিয়া যেই হনুমান সেটাকে ধরিতে গিয়াছে, অমনি ইন্দ্র ব্যস্ত হইয়া তাহার উপরে বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সেই বজ্রের ঘায় একটা পাহাড়ের উপর পড়িয়া 'হনু' অর্থাৎ দাড়ি ভাঙিয়া যাওয়াতেই তাহার 'হনুমান' এই নামটি হইয়াছিল। পাহাড়ের উপর পড়িয়া সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে; এমন সময় তাহার পিতা পবন আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া একটা পর্বতের গুহায় লইয়া গেলেন। তারপর তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, 'দাঁড়াও, ইহার শোধ ভালমতেই লইব!'

পবন, অর্থাৎ বায়ু হইতেছেন সংসারের প্রাণ, সেই বায়ু রাগিয়া বসিলে কী বিপদই না ঘটিতে পারে! সেই রাগের চোটে বাহিরের বায়ু কোথায় চলিয়া গেল, দেহের ভিতরের বায়ু উৎকট হইয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া জীব-জন্তুর প্রাণ যায়-যায়। বায়ুর উৎপাতে সকলের মাথা খারাপ হইয়া গেল, তাহারা এক করিতে আর এক করিয়া বসে। দেবতাদের অবধি পেট ফাঁপিয়া মানুষের মত হইয়া গেল, ঠিক যেন উদরীর ব্যারাম।

সেই অবস্থায় সকল দেবতা কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, 'প্রভু! আমাদের দশা দেখুন! ইহার উপায় কী হইবে।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'উপায় আর কী? চল বায়ুর নিকট গিয়া তাঁহাকে খুশি করি। ইহা ভিন্ন আর গতি নাই।'

পবন অচেতন হনুমানকে কোলে লইয়া গুহায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মাকে লইয়া দেবতাগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মা আসিয়া হনুমানের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেই সে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, যেন তাহার কখনও কোন অসুখ হয় নাই। ইহাতে পবন কতদূর খুশি হইলেন বুঝিতেই পার! পবনের রাগ চলিয়া যাওয়াতে সংসারের সকল জীবের বিপদও কাটিয়া গেল।

তখন ব্রহ্মা দেবতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, এই খোকা বড় হইলে তোমাদের অনেক কাজ করিয়া দিবে। সুতরাং তোমরা সকলে ইহাকে বর দিয়া খুশি কর। এ কথায় দেবতারা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া হনুমানকে বর দিতে লাগিলেন। সেইসকল বরের জোরে হনুমান চিরজীবী হইয়া গেল। কোন দেবতা বা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব বা মানুষের কোন অস্ত্রে তাহার মরণের ভয় রহিল না। কেহ শাপ দিয়া তাহার প্রাণনাশ করার পথ অবধি বন্ধ হইল। তাহা ছাড়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে, আর যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি রূপ ধরিতে পারিবে।' সূর্য বলিলেন, 'আমার তেজের শত ভাগের এক ভাগ দিলাম। আর

একটু বয়স হইলে আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইব, তাহা হইলে তুমি খুব বলিতে কহিতে পারিবে।'

বর পাইয়া হনুমান বড়লোক হইয়া গেল। তবে, অবশ্য, ইহার সকল ফল ফলিতে সময় লাগিয়াছিল। শিশুকালে তাহার স্বভাব অন্যান্য বানরছানার চেয়ে বেশি উঁচুদরের ছিল না। মুনিদের আশ্রমে গিয়া সে দৌরাত্ম্যটা যা করিত, সে আর বলিবার নয়। তাহার পিতামাতা কত নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে কি নিষেধ শুনিবার পাত্র? তাহার উৎপাতে মুনিদের কোশা-কুশী, ঘটি-বাটী, কাপড়-চোপড় কিছুই আগলাইয়া রাখিবার জো ছিল না। এদিকে আবার তাহাকে শাপ দিয়াও ফল নাই, কারণ ব্রহ্মার বরে শাপে মরিবার ভয় তাহার কাটিয়া গিয়াছে,—আর তাহাকে দেখিয়া তাঁহাদের কতকটা মায়াও হইত। কাজেই তাঁহারা নিরুপায় হইয়া তাহার অত্যাচার সহ্য করিতেন, আর ভাবিতেন, উহাকে বেশি ক্লেশ না দিয়া কী উপায়ে একটু জব্দ করা যায়। শেষে অনেক বুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে এই শাপ দিলেন যে, 'যা বেটা, তোর যত ক্ষমতা তাহার কথা তুই একেবারে ভুলিয়া যা। বড় হইলে কেহ সেই ক্ষমতার কথা মনে করাইয়া দিবে, তখন তুই অনেক অদ্ভুত কাজ করবি।'

তখন হইতে হনুমান সামান্য বানর-ছানার ন্যায় নিতান্ত ভয়ে ভয়ে চলে, আর দূর হইতে কাহাকেও দেখিলেই প্রাণপণে ছুটিয়া পালায়। কাজেই মুনিদেরও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হয় না। যাহা হউক, সে এর মধ্যে সূর্যের নিকট ঢের লেখাপড়া শিখিয়া ফেলিল। মুনিদের বাড়ি সে যাহাই করুক, লেখাপড়ায় যে সে খুব লক্ষ্মী ছেলে ছিল, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কী পরিশ্রম করিয়াও না সে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সূর্য তো আর এক জায়গায় বসিয়া থাকেন না, যে পুঁথি লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিলেই কাজ হইবে। হনুমানকে উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত রোজ তাঁহার পিছু-পিছু ছুটাছুটি করিয়া পড়া বুঝিয়া লইতে হইত। তাহার ফলে সে বিদ্বানও হইয়াছিল বড়ই ভারি রকমের। এমন পণ্ডিত অতি অল্পই জন্মাইয়াছে।

সগর রাজার কথা

ইক্ষ্বাকু বংশে সগর নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রূপে গুণে, বিদ্যায়, বীরত্বে তাঁহার সমান আর সেকালে কোন রাজাই ছিলেন না। সব বিষয়েই তিনি সুখী ছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল, তাঁহার পুত্র ছিল না। পুত্র-লাভের জন্য তিনি তাঁহার বৈদর্ভী এবং শৈব্যা নাম্নী দুই রানীকে লইয়া কৈলাস পর্বতে গিয়া কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে শিব রাজার

তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি কী চাও?'

রাজা ভক্তিভরে শিবকে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান, আমার পুত্র নাই। আমার মৃত্যুর পর আমার বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিবার লোক থাকিবে না, আমার বংশ লোপ হইয়া যাইবে। সুতরাং যদি আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে আমার পুত্র হয় এমন বর দিন।'

শিব কহিলেন, 'মহারাজ, তোমার এক রানীর ষাট হাজার পুত্র হইবে, কিন্তু তাহারা সকলেই একসঙ্গে মরিয়া যাইবে। আর এক রানীর একটি পুত্র হইবে, সে-ই তোমার বংশ রক্ষা করিবে।'

এই বলিয়া শিব আকাশে মিলাইয়া গেলেন, রাজাও আনন্দের সহিত রানী-দিগকে লইয়া দেশে ফিরিলেন।

কিছুদিন পরে বৈদর্ভীর ষাট হাজারটি আর শৈব্যার একটি পুত্র হইল। বৈদর্ভীর ষাট হাজার পুত্র জন্মিবার সময় বড়ই আশ্চর্য ঘটনা হয়। ছেলেগুলি একটা লাউয়ের ভিতরে ছিল। লাউ দেখিয়া রাজা তাহা ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এমন সময় আকাশ হইতে কে যেন অতি গম্ভীর স্বরে বলিল, 'মহারাজ, ওটাকে ফেলিয়া দিও না। উহার ভিতরেই তোমার ষাট হাজার পুত্র আছে। উহার ষাট হাজারটি বীচিকে ঘৃতের কলসীর ভিতরে রাখিয়া দাও, দেখিবে, তোমার ষাট হাজার পুত্র হইবে।'

সুতরাং রাজা আর লাউটি ফেলিয়া না দিয়া উহার বীচিগুলি ঘিয়ের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে অনেকদিন পরে সেই বীচির ভিতর হইতে ষাট হাজারটি সুন্দর খোকা বাহির হইল। সেই খোকাগুলি বড় হইয়া ষাট হাজারটা অসুরের মতন গোঁয়ার গুণ্ডা হইল। তাহাদের জ্বালায় মানুষের কথা আর কী বলিব,—দেবতা গন্ধর্ব পর্যন্ত সুস্থির হইয়া বসিতে পারিত না।

শেষে সকলে তাহাদের দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিল, 'ভগবান, আর তো পারি না। ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের একটা উপায় করুন।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আর অতি অল্পদিনের ভিতরেই ইহারা নিজেদের স্বভাব-দোষে নষ্ট হইবে।'

এ কথায় সকলে কতকটা নিশ্চিত হইয়া, ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্বক যে যাহার ঘরে ফিরিল।

তারপর একবার সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষক হইল ঐ ষাট হাজার রাজপুত্র। তাহারা দিনকতক তাহাকে দেশে দেশে তাড়াইয়া ফিরিলে সে শুকনো সাগরের বালির উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ কোথায় যে চলিয়া গেল, রাজপুত্রেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন তাহারা দেশে ফিরিয়া তাহাদের পিতাকে বলিল যে, 'বাবা, সর্বনাশ হইয়াছে, ঘোড়া হারাইয়া গিয়াছে!'

এ কথা শুনিয়া সগর বলিলেন, 'তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে খুব ভাল করিয়া খোঁজ।'

তখন রাজপুত্রেরা আবার ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা আবার তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, 'বাবা, আমরা শহর, বাজার, পাহাড়, পর্বত, বন, বাদাড় কিছুই বাকি রাখি নাই। কিন্তু ঘোড়া তো কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না!'

এ কথায় সগর রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, 'দূর হ তোরা এখান হইতে! ঘোড়া না লইয়া তোরা আর দেশে মুখ দেখাইতে পারিবি না!'

সুতরাং আবার ষাট হাজার ভাই ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা আবার সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাহার এক জায়গায় একটা গভীর গর্ত রহিয়াছে। তখন ষাট হাজার ভাই ষাট হাজার কোদাল লইয়া সেই গর্তের চারিধার খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেক খুঁড়িয়াও তাহারা সেই সর্বনেশে গর্তের তলা পাইল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি সেই গর্তের ভিতরে উঁকি মারিলে, যেমন অন্ধকার ছিল তেমনই অন্ধকার দেখা যায়।

ইহাতে তাহারা রাগের ভরে আরো বেশি করিয়া খুঁড়িতে লাগিল। গর্ত যতই অন্ধকার দেখা যায়, তাহারা ততই খালি বলে, 'খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়্!' এমনি করিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইল। পাতালে গিয়াই তাহারা দেখিল যে, সেখানে কপিল মুনি বসিয়া আছেন, আর ঘোড়াটি তাঁহার কাছেই ঘাস খাইতেছে। ঘোড়া দেখিয়া আর কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে? তখন কপিল যে সেখানে বসিয়া আছেন তাহা যেন তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। কপিলকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহারা ঘোড়া ধরিতে ছুটিয়া চলিল।

ইহাতে কপিল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দুই চক্ষু লাল করিয়া, ভীষণ ভ্রূকুটির সহিত উহাদিগের পানে তাকাইবা মাত্র সেই ষাট হাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

যখন এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়, তখন নারদ মুনি সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনিই রাজপুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ সগরকে শুনান। পুত্রদিগের মৃত্যুর কথা শুনিয়া সগর দুঃখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর নিজের নাতি অংশুমানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন যে, 'এখন তুমি ঘোড়া না আনিতে পারিলে তো আর উপায় দেখি না!'

শৈব্যার যে একটি পুত্র হয়, তাহার নাম ছিল অসমঞ্জ। এমনই দুষ্ট ছিল যে, সে ছোট ছোট ছেলে-পিলের গলায় ধরিয়া তাহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিত। তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া সকলে সগরের নিকট নালিশ করাতে, তিনি তাহাকে দেশ

হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অংশুমান সেই অসমঞ্জর পুত্র।

সগরের কথায় অংশুমান সেই গর্তের ভিতর দিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন, কপিল তখনও সেখানে বসিয়া ছিলেন, আর ঘোড়াটাও তাঁহার কাছে ছিল। অংশুমান মুনিকে দেখিবামাত্র ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করাতে, মুনি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বাঃ, বেশ তো ছেলেটি! তুমি কী চাও, বৎস?'

অংশুমান জোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান, আপনি দয়া করিয়া ঘোড়াটি আমাকে দিলে আমাদের যজ্ঞ শেষ হইতে পারে।'

মুনি বলিলেন, 'বটে? তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া? এখনি তুমি ওটাকে নিয়া যাও! তোমার আর কিছু চাই?'

অংশুমান জোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান, দয়া করিয়া যদি আমার খুড়ো-মহাশয়দিগকে উদ্ধার করিয়া দেন, তবে ভাল হয়।'

মুনি বলিলেন, 'তুমি যখন চাহিতেছ, তখন তাহাও হইবে। কিন্তু সে এখন নহে, আর তাহা এত সহজে হইবে না। তোমার যে নাতি হইবে, সে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া তাঁহার সাহায্যে স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে লইয়া আসিবে। সেই স্বর্গের নদী গঙ্গার জল লাগিলে তোমার খুড়াগণ উদ্ধার পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন শীঘ্র ঘোড়া লইয়া দেশে গিয়া যজ্ঞ শেষ কর। তোমার মঙ্গল হউক।'

এইরূপে অংশুমান ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলে, সগরের অশ্বমেধ শেষ হইল।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। তারপর তাঁহার পুত্র পরম ধার্মিক এবং সত্যবাদী মহারাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিলেন।

এই ভগীরথই তপস্যার বলে গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র জল লাগিয়া সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধার সাধন হইয়াছিল।

এইজন্যই গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী।

রাবণ

রাবণের কথা তোমরা সকলেই জান। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মায়ের নাম কৈকসী। বিশ্রবা পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন। রাবণ আর তাঁহার ভাই বোনেরা জন্মিবার পূর্বেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'ইহাদের সকলের ছোটটি খুব ধার্মিক হইবে, আর সকলেই ভয়ঙ্কর দুষ্ট রাক্ষস হইবে।'

মুনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর তাহাদের বোন সূর্পণখা, ইহাদের এক একটা এমনি বিকট আর দুষ্ট রাক্ষস হইল যে কী বলিব।

ইহাদের ছোট ভাই বিভীষণও রাক্ষস ছিল বটে, কিন্তু সে যারপরনাই ভাল লোক ছিল।

রাবণের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত ছিল। দাঁতগুলো ছিল থামের মত বড় বড়। চুলগুলি আগুনের শিখার মত লাল, আর শরীরটা ছিল কালো পর্বতের মত বিশাল। তাহার জন্মের সময় পৃথিবী কাঁপিয়াছিল, সূর্য ময়লা হইয়া গিয়াছিল আর সমুদ্রের জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'দশগ্রীব'। উহাই উহার আসল নাম, রাবণ নাম পরে হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় রাবণ ভাইদিগকে লইয়া দশ হাজার বৎসর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিল। এই দশ হাজার বৎসর সে আহার করে নাই। এক এক হাজার বৎসর যাইত, আর নিজের নিজের এক একটি মাথা কাটিয়া সে আগুনে আহুতি দিত। নয় হাজার বৎসরে নয়টি মাথা সে এইরূপ করিয়া আগুনে দিল। তারপর দশ হাজার বৎসর পূর্ণ হইল, যেই সে তাহার বাকি একটি মাথাও কাটিতে যাইবে, অমনি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, 'দশগ্রীব, আমি খুশি হইয়াছি, এখন তুমি বর লও।'

দশগ্রীব বলিল, 'আমাকে অমর করিয়া দিন।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'সেটি হইবে না, অন্য বর লও। দশগ্রীব বলিল, 'তবে এই বর দিন যে, দানব, দৈত্য, যক্ষ, নাগ, পক্ষী ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'তাহাই হইবে। তাহা ছাড়া তোমার যে মাথাগুলি কাটিয়া দিয়াছ তাহাও ফিরিয়া পাইবে, ইহার উপর আবার যখন যে রূপ তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনি চেহারা ধরিতে পারিবে।'

কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণও এই দশ হাজার বৎসর খুব তপস্যা করিয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মা তাহাদিগকেও বর দিতে গেলেন। বিভীষণ বলিল, 'আমাকে দয়া করিয়া এই বর দিন যে, আমার ধর্মে মতি থাকে।' এ কথায় ব্রহ্মা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে সে বর তো দিলেনই, তাহা ছাড়া তাহাকে অমর করিয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণকে বর দিবার সময় দেবতারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'প্রভু, এমন কাজ করিবেন না, এ বেটা বর পাইলে আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে! এর মধ্যেই কতজনকে ধরিয়া খাইয়াছে!'

তাই তো, এখন তবে কী করা যায়? তপস্যা করিয়াছে, কাজেই বর দিতেই হইবে, আবার বর দিলেই বিপদের কথা। তখন ব্রহ্মা বুদ্ধি করিয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিলেন।

সরস্বতী ঢুকিতেই তাহার মাথায় কি গোল লাগিয়া গেল, আর বেচারা ঠিক করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ব্রহ্মা বলিলেন, 'কুম্ভকর্ণ, কী চাই?' কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমি খালি ঘুমাইতে চাই। ছয় মাস ঘুমাইয়া একদিন উঠিয়া খাইব।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'বেশ কথা, তাই হোক।' এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর কুম্ভকর্ণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিল, 'তাই তো! এটা

কী করিলাম ? দেবতা বেটারা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল নাকি ?'

যা হোক, আমরা দশগ্রীবের কথা বলিতেছি। সে তো বর পাইয়া নিতান্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, এখন আর কেহ তাহার কোন কথায় 'না' বলিতে ভরসা পায় না। দশগ্রীবের এক দাদা ছিলেন, তাঁহার নাম কুবের। তিনিও বিশ্রবা মুনির পুত্র, তাঁহার মাতা ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনী। কুবের লঙ্কায় বাস করিতেন। দশগ্রীব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, 'দাদা, লঙ্কাপুরীখানি আমাকে ছাড়িয়া দাও।'

কাজেই তখন কুবের আর কী করেন ? ভালোয় ভালোয় না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া নিবে। তাহার চেয়ে তিনি কৈলাস পর্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবও তখন পরম আনন্দে রাক্ষসের দল-সমেত লঙ্কায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দশগ্রীব বিদ্যুজ্জিব নামক দানবের সহিত সূর্পণখার বিবাহ দিল। তাহাদের তিন ভাইয়ের বিবাহ হইতেই আর বেশি বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, শুভকার্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঘোর নিদ্রা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরিয়া বসিল। তাহার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢুলিয়া পড়িল, সে বিকট মুখে ভীষণ হাই তুলিয়া বলিল, 'দাদা, বড়ই ঘুম পাইয়াছে আমার, শয়নের জন্য ঘর তৈয়ার করিয়া দাও।' তখনই রাবণের হুকুমে চমৎকার একটি শয়ন-ঘর প্রস্তুত হইল। তাহার ভিতরে গিয়া সেই যে কুম্ভকর্ণ শুইল, ছয় মাসের আগে আর উঠিল না।

এদিকে দশগ্রীবের জ্বালায় ত্রিভুবন অস্থির। সে দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি, ঋষি কাহাকেও মানে না, একধার হইতে সকলকে মারিয়া তাহাদের বাড়ি, ঘর, বাগান সব চুরমার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুবের তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে বারণ করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। সে দূতের কথা দশগ্রীব তো শুনিলই না, লাভের মধ্যে বেচারাকে কাটিয়া রাক্ষসদিগকে খাইতে দিল। তারপর রথে চড়িয়া এই বলিয়া সে বাহির হইল যে 'আমি ত্রিভুবন জয় করিব।'

বাহির হইয়াই সে সকলের আগে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল—তাহার উপরেই রাগটা বেশি। কুবেরের সৈন্যরা অনেক যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দশগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসেরা গিয়াছিল, তাহারা যক্ষদের এমনি দুর্গতি করিল যে তাহা আর বলিবার নহে। যক্ষেরা সোজাসুজি সরলভাবে যুদ্ধ করে, আর রাক্ষসেরা নানারকম ফাঁকি দেয়, কাজেই যক্ষেরা হারিয়া গেল। কুবের নিজে আসিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। দশগ্রীব তাঁহাকে অস্ত্রের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া, তাঁহার 'পুষ্পক' নামক রথখানি লইয়া চলিয়া গেল। সে রথ বড়ই আশ্চর্যের ছিল। তাহাতে সঙ্গে দানা, পানি, সইস, কোচমান কিছুরই দরকার হইত না। যেখানে যাইবার হুকুম পাইত অমনি সে উড়িয়া গিয়া সেখানে হাজির হইত।

পুষ্পক রথে চড়িয়া দশগ্রীব বিশাল শরবনে গিয়া উপস্থিত হইল। পর্বতের

উপরে সে অতি পবিত্র বন, কার্তিকের জন্মস্থান, তাহার উপর দিয়া কোন রথের যাইবার হুকুম নাই। বিশেষত শিব আর পার্বতী তখন সেখানে ছিলেন। কাজে-কাজেই পুষ্পক রথ সেখানে গিয়া আটকাইয়া গেল। ইহাতে দশগ্রীব যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় শিবের দূত নন্দী আসিয়া তাহাকে বলিল যে, 'দশগ্রীব, মহাদেব এখানে আছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।'

নন্দীর চেহারা বড়ই অদ্ভুত ছিল। ছোট্ট-খাট্টো পিঙ্গলবর্ণ লোকটি, হাত দুখানি এতটুকু, মাথাটি নেড়া, মুখখানি বানরের মত। দশগ্রীব তাহার কথা শুনিবে কি, সে হাসিয়াই অস্থির। কিন্তু নন্দী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই ষণ্ডা, তাহাতে আবার হাতে ভয়ঙ্কর শূল। দশগ্রীব রাগের ভরে রথ হইতে নামিয়া সবে বলিয়াছিল—'কে রে তোর মহাদেব?' অমনি নন্দী তাহাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিল। তখন সে ভারি চটিয়া বলিল, 'বটে? আমাকে যাইতে দিবি না? আচ্ছা দাঁড়া, তোদের পাহাড় আমি তুলিয়া নিব!' এই বলিয়া সত্য-সত্যই সে কুড়ি হাতে সেই পর্বতের তলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সে কি যেমন-তেমন টান? টানের চোটে পর্বত নড়িয়া উঠিল, শিবের ভূতগুলি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, পার্বতী যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। মহাদেব কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না।

তিনি কেবল পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়া পর্বতখানিকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। তাহাতেই সে তাহার জায়গায় বসিয়া গেল, আর অমনি দরজার কামড়ে দুষ্ট খোকার আঙ্গুল আটকাইবার মতন দশগ্রীব মহাশয়ের হাত-কখানিও পর্বতের চাপনে আটকাইয়া গেল।

তখন তো দশগ্রীব দশমুখে ভ্যা ভ্যা শব্দে চ্যাঁচাইয়া অস্থির। চিৎকারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল, সাগর উছলিয়া উঠিল, দেবতারা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন।

হাজার বৎসর ধরিয়া দশগ্রীব ঐরূপ চ্যাঁচাইয়াছিল, আর মহাদেবকে ক্রমাগত মিনতি করিয়াছিল। মহাদেবের দয়ার কথা সকলেই জান। বেচারার এই কষ্ট দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া তো দিলেনই, তাহার উপর আবার ভারি ভারি কয়েকটি অস্ত্রও তাহাকে দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, 'দশগ্রীব, তুমি চমৎকার চ্যাঁচাইয়াছিলে, তোমার চিৎকারে সকলেই ভয় পাইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তোমার নাম রাবণ (যে চিৎকারে লোকের ভয় লাগাইয়া দেয়) হইল।' দশগ্রীব দেখিল, পাহাড় চাপা পড়িয়া মোটের উপর তাহার লাভই হইয়াছে, কাজেই সে খুব খুশি হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

দশগ্রীব শিবের নিকট বর পাইয়া রাবণ হইল, অস্ত্রশস্ত্রও অনেকগুলি পাইল। তখন হইতে সে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, আর রাজারাজড়া যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই বলে, 'হয় যুদ্ধ কর না হয় হার মান!'

উষীরবীজ নামে একটা জায়গায় মরুত্ত নামে এক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, রাবণ পুষ্পক রথে চড়িয়া হেঁইয়ো হেঁইয়ো শব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞের

স্থানে দেবতাদের অনেকেই ছিলেন, রাবণকে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। ছুটিয়া যে পালাইবেন, এতটুকুও তাঁহাদের ভরসা হইল না,—কী জানি পাছে ধরিয়া ফেলে! তাই তাঁহারা সেইখানেই নানা জন্তুর বেশ ধরিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ূর, ধর্ম হইলেন কাক, কুবের হইলেন গিরগিটি, বরুণ হইলেন হাঁস।

এদিকে মরুত্তের সঙ্গে রাবণের খুবই যুদ্ধ বাধিবার যোগাড় দেখা যাইতেছে, গালাগালি আরম্ভ হইয়াছে, মারামারিরও বিলম্ব নাই, এমন সময় মরুত্তের গুরু সম্বর্ত মুনি তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ! যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, কেন না তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সর্বনাশ হইবে।' কাজেই মরুত্ত চুপ করিয়া গেলেন, আর রাবণ 'জিতিয়াছি, জিতিয়াছি' বলিয়া খুবই বাহাদুরি করিতে লাগিল। তারপর সেখানে যত মুনি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলকে খাইয়া যারপরনাই খুশি হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন দেবতা মহাশয়েরা আবার যাঁর যাঁর বেশ ধরিয়া মনে করিলেন, 'বাবা, বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছি!' যে সকল জন্তুর সাজ তাঁহারা নিয়াছিলেন তাহাদের উপরে অবশ্য তাঁহারা খুবই খুশি হইলেন, আর তাহাদিগকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ময়ূরকে বলিলেন, 'তোমার সাপের ভয় থাকিবে না, আর আমার যেমন হাজার চোখ, তোমার লেজেও তেমনি হাজার চোখ হইবে।' ময়ূরের লেজে আগে শুধুই নীল বর্ণ ছিল, তখন হইতেই তাহাতে চমৎকার চক্র দেখা দিল।

ধর্ম কাককে বলিলেন, 'তোমার আর কোন অসুখ হইবে না। মরণের ভয়ও তোমার দূর হইল, কেবল মানুষে যদি মারে তবেই তোমার মৃত্যু হইবে।'

বরুণ হাঁসকে বলিলেন, 'তোমার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা হইবে।' তখন হইতে হাঁস সাদা হইয়াছে। আগে তাহার আগাগোড়া সাদা ছিল না, পাখার আগা নীল, আর কোলের দিকে ছেয়ে রঙের ছিল।

কুবের গিরিগিটিকে বলিলেন, 'তোমার মাথা সোনার মত হইবে।' সেই হইতে গিরগিটির মাথায় সোনালি রঙ।

এদিকে রাবণের আর গর্বের সীমাই নাই। দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি বড়-বড় রাজারা তাহার নিকট হার মানিয়া গেলেন। অন্যের তো কথাই নাই। কিন্তু অযোধ্যার রাজা অনরণ্য কিছুতেই তাহার নিকট হার মানিতে রাজী হইলেন না। তিনি আগেই অনেক সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাবণ তাঁহার রাজ্যে আসিবামাত্র সেইসকল সৈন্য লইয়া তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হায়, তাঁহার সে সৈন্য রাবণের সৈন্যদের কাছে দু-দণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল, নিজেও রাবণের হাতে ভয়ানক আঘাত পাইয়া রথ হইতে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন, রাবণ তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'কি! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন কেমন হইল?' অনরণ্য বলিলেন, 'মরিতে তো একদিন সকলকেই হয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে হটি নাই, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছি, আর আমি

একথা তোমাকে বলিতেছি যে, আমাদের এই বংশে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইবে, সেই রামের হাতে তুমি তোমার উচিত সাজা পাইবে।'

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই দেবতারা তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজাও দেহ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া গেলেন।

একবার রাবণ মানুষ তাড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দেখিল যে মেঘের উপর দিয়া নারদ মুনি হরিনাম করিতে করিতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, 'ঠাকুর-মহাশয় মঙ্গল তো? কী জন্য আসিয়াছেন?'

নারদ বলিলেন, 'আসিয়াছি, সে বাপু একটা কথা আছে। এইসব মানুষ যখন মৃত্যুর বশ, তখন এরা তো মরিয়াই রহিয়াছে, ইহাদিগকে মারিবার জন্য তুমি আবার এত পরিশ্রম কেন করিতেছ? ইহারা আপনা-আপনিই একদিন যমের বাড়ি যাইবে। বাস্তবিক যমই যত নষ্টের গোড়া। অতএব, সেই বেটাকে যদি জব্দ করিতে পার, তবে সকলকেই জয় করা হইবে।'

রাবণ বলিল, 'বড় ভাল কথা বলিয়াছেন, ঠাকুর মহাশয়! আমি এখনই যাইতেছি।' বলিয়াই আর এক মুহূর্তও দেরী নাই, অমনি রাবণ যমপুরীর পথ ধরিয়াছে। তখন নারদ ভাবিলেন, 'এবারে মজাটা হইবে ভাল। যাই, একবার দেখিয়া আসি।'

নারদ রাবণের আগেই গিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম বিচারাসনে বসিয়া অগ্নিসাক্ষী করিয়া সকলের পাপ-পুণ্যের বিচার করিতেছিলেন, নারদকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কারপূর্বক বলিলেন, 'মুনিঠাকুরের আজ কী চাই?'

নারদ বলিলেন, 'সাবধান হও বাছা, রাবণ তোমাকে জয় করিতে আসিতেছে। মুশকিল হইতে আটক নাই কিন্তু বেটা বড় বেখাপ্পা লোক।'

বলিতে বলিতেই রাবণের ঝকঝকে পুষ্পক রথ আসিয়া দেখা দিল। রথ হইতে নামিয়াই সে দেখিল, নরকের কুণ্ডে দলে দলে পাপীসকল যমদূতগণের তাড়ানায় চিৎকার করিতেছে। অমনি আর কথাবার্তা নাই। সে যমদূতগুলিকে বিধিমত ঠ্যাঙাইয়া সকল পাপীকে ছাড়িয়া দিল। সে বেচারারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যে কী আশ্চর্য আর খুশি হইল, তাহা আর বলিবার নয়। তখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে বড়ই ভয়ঙ্কর। যমপুরীতে অসংখ্য সিপাহী সান্ত্রী থাকে, তাহাদের এক-একজন ভয়ানক যোদ্ধা। তাহারা রাবণ আর তাহার লোকগুলিকে মারিয়া রক্তারক্তি করিল। মার খাইয়াও কিন্তু রাবণ যুদ্ধ করিতে ছাড়ে না, শূল শক্তি প্রাস গদা গাছ পাথর কত যে ছুঁড়িল তাহার লেখাজোখা নাই। তখন যমের লোকেরা আর রাক্ষসকে ছাড়িয়া কেবল রাবণের উপরেই এমন ভয়ানক অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তাহাতে পুষ্পক রথ অবধি ডুবিয়া গিয়া রাবণের দম আটকাইয়া মরিবার গতিক। দুর্দশার একশেষ। রক্তধারায় দেহ ভাসিয়া গেল; কবচ কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। কাজেই তাহাকে রথ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।

এতক্ষণে আর রাবণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এবারে একটু বেগতিক, একটা বড় রকমের অস্ত্র না ছাড়িতে পারিলে আর চলিতেছে না। কাজেই সে তখন ধনুকে পশুপতির অস্ত্র জুড়িয়া যমের লোকদের বলিল, 'দাঁড়া বেটারা, এবার তোদের দেখাইতেছি!' এই বলিয়া সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছাড়িবামাত্রই তাহার তেজে যমের সকল সিপাহী ভস্ম হইয়া গেল। তখন রাবণের আর রাক্ষসগণের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে আর কি!

সেই সিংহনাদ শুনিয়াই যম বুঝিতে পারিলেন যে রাক্ষসদিগের জয় হইয়াছে। তখন কাজেই রথে চড়িয়া তাঁহাকে স্বয়ংই বাহির হইতে হইল। সে যে কী ভয়ঙ্কর রথ সে কথা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার উপর আবার স্বয়ং মৃত্যু প্রাস মুদগর লইয়া ভীষণ বেশে যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। কালদণ্ড প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে।

সেই রথ আর তাহার ভিতর মৃত্যুকে দেখিয়াই রাবণের লোকেরা 'বাপরে! আমাদের যুদ্ধে কাজ নাই!' বলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে ভয় না পাইয়া যমের সঙ্গে খুবই যুদ্ধ করিতে লাগিল। অস্ত্রের ভয় তো তাহার নাই, কারণ সে জানে যে ব্রহ্মার জোরে সে মরিবে না। কাজেই অনেক খোঁচা যেমন খাইল, খোঁচা দিলও ততোধিক। খোঁচা খাইয়া যম রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তখন মৃত্যু যমকে বলিল, 'আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এই দুষ্টকে মারিয়া দিতেছি। আমি ভাল করিয়া তাকাইলে আর ইহাকে এক মুহূর্তও বাঁচিতে হইবে না।' যম বলিলেন, 'দেখ না, আমি ইহাকে কী সাজা দিই!' এই বলিয়া তিনি রাগে দুই চোখ লাল করিয়া তাঁহার সেই ভীষণ কালদণ্ড হাতে নিলেন। সে দণ্ড যাহার উপর পড়ে তাহার আর রক্ষা থাকে না।

যমকে কালদণ্ড তুলিতে দেখিয়া ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, কে কোন দিক দিয়া পালাইবে তাহার ঠিক নাই, দেবতাদের অবধি বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছে। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া যমকে বলিলেন, 'সর্বনাশ, কর কী? এই কালদণ্ড তুমি ছুঁড়িলেই যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কালদণ্ড আমিই গড়িয়াছি, রাবণকেও আমিই বর দিয়াছি। আমিই বলিয়াছি কালদণ্ড কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না, আবার আমিই বলিয়াছি যে রাবণ কোন দেবতার হাতে মরিবে না। এখন এই অস্ত্রে যদি রাবণ মরে, তাহা হইলে আমার কথা মিথ্যা হয়, যদি না মরে তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়। লক্ষ্মীটি, আমার মান রাখ, এ অস্ত্র তুমি ছুঁড়িও না।'

যম তখন আর কী করেন? তিনি বলিলেন, 'আপনি হইতেছেন আমাদের প্রভু, সুতরাং আপনার হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু এ দুষ্টকে যদি মারিতেই না পারিলাম, তবে আর আমার এখানে থাকিয়া কী ফল?' এই বলিয়া যম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে

বলিল, 'দুয়ো! দুয়ো! হারিয়া গেল!' ততক্ষণে অন্য রাক্ষসদেরও খুবই সাহস হইয়াছে আর তাহারা আসিয়া 'জয় রাবণের জয়!' বলিয়া আকাশ ফাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ব্রহ্মার কথায় যম যুদ্ধ ছাড়িয়া ছিলেন। রাবণ ভাবিল, সেটি নিজেরই বাহাদুরি। তখন আর তাহার গর্বের সীমাই রহিল না। সে বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় যোদ্ধাদের সহিত বিবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণের পুত্রগণ তাহার নিকট হারিয়া গেলেন, বরুণ নিজে ব্রহ্মার বাড়িতে গান শুনিতে যাওয়ায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁহার মান বাঁচিল। সূর্য যুদ্ধ না করিয়াই বলিলেন, 'আমি হার মানিতেছি', রাবণের ভগ্নিপতি বিদ্যুজ্জিব বেচারিও তাহার হাতে মারা গেল।

কিন্তু সকল জায়গায়ই যে রাবণ বাহাদুরি পাইয়াছিল তাহা নহে। বলির বাড়িতে গিয়া সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। বলি তাহাকে ধরিয়া নিজের কোলে বসাইয়া বলিলেন, 'কী চাও বাপ?' রাবণ বলিল, 'শুনিয়াছি বিষ্ণু নাকি আপনাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।'

এ কথা শুনিয়া বলির ভারি হাসি পাইল। তারপর তিনি কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, 'ঐ যে ঝকঝকে চাকাটি দেখিতেছ ওটি আমার কাছে লইয়া আইস তো!' এ কথায় রাবণ নিতান্ত অবহেলার সহিত গিয়া সেই জিনিসটি উঠাইল, কিন্তু কিছুতেই সেটিকে লইয়া আসিতে পারিল না। সে লজ্জিত হইয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

খানিক পরে রাবণের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তখন আর লজ্জায় বেচারা মাথা তুলিতে পারে না। তখন বলি তাহাকে বলিলেন, 'এই চাকাটি আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল।'

আর একবার রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া একটি দ্বীপে আগুনের মত তেজস্বী এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ বলিল, 'যুদ্ধ দাও!' তারপর সে তাঁহাকে কত শূল, কত শক্তি, কত যষ্টি, কত পট্টিশের ঘা মারিল, কিন্তু তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না; তখন সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ রাবণকে টিকটিকির মত ধরিয়া দু হাতে এমনি চাপিয়া দিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ যায়-যায়। তারপর তিনি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎ পরে রাবণ উঠিয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই ভয়ঙ্কর লোকটা কোথায় গেল?' রাক্ষসেরা একটা গর্ত দেখাইয়া বলিল, 'সে ইহারই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।' অমনি রাবণও তাড়াতাড়ি সেই গর্তের ভিতরে ঢুকিল। তারপর পাতালের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় গিয়া দেখিল সেই মহাপুরুষ একটা খাটের উপর ঘুমাইয়া আছেন। সেখানে গিয়া রাবণ সবে দুষ্টু ফন্দি আঁটিতেছে, এমন সময় ভয়ঙ্কর পুরুষ হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, আর তাহাতেই রাবণ কানে তালা লাগিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তখন ভয়ঙ্কর পুরুষ তাহাকে বলিলেন, 'আর কেন?

এইবেলা চলিয়া যাও! ব্রহ্মা তোমাকে অমন হইবার বর দিয়াছেন, কাজেই তোমাকে বধ করা হইল না।' এই ভয়ঙ্কর পুরুষ ছিলেন ভগবান কপিল।

আর একবার রাবণ গিয়াছিল মাহিষ্মতীর রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে। মাহিষ্মতীতে গিয়া সে অর্জুনের মন্ত্রীদিগকে বলিল, 'তোমাদের রাজা কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।' মন্ত্রীরা বলিলেন, 'তিনি বাড়ি নাই।'

এ কথায় রাবণ সেখান হইতে বিন্ধ্যপর্বতে চলিয়া আসিল। বিন্ধ্য অতি সুন্দর পর্বত। সেই পর্বতের নীচ দিয়া নর্মদা নদী বহিতেছে, তাহার শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এমন নির্মল জল, এমন শীতল বায়ু, এত রকমের ফুল আর অতি অল্প স্থানেই আছে। রাবণ মনের সুখে সে জলে নামিয়া স্নান করিল।

ঠিক সেই সময়ে একটা ভারি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছিল। নর্মদার জল স্বভাবতই পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে তাহা এক-একবার উঁচু হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিক ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে রাবণ যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া দুই অনুচর শুক সারণকে বলিল, 'দেখ তো ব্যাপারটা কী!'

শুক সারণ তখনই পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল, আর খানিক পরেই ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, প্রকাণ্ড শাল গাছের মত উঁচু একটা লোক নর্মদায় নামিয়া স্নান করিতেছে। উহার এক হাজারটা হাত। সেই হাজার হাতে সে এক-একবার নদীর জল আগলাইয়া ঠেলিয়া দিতেছে, আর তাহাতেই সে জল এত উঁচু হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।'

এ কথা শুনিয়া রাবণ বলিয়া উঠিল—'অর্জুন!' তারপর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া অমনি গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। অর্জুনের লোকেরা তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু রাক্ষসেরা তাহাদের মারিয়া ধরিয়া খাইয়া নাকাল করিয়াছিল।

অর্জুন একথা শুনিতে পাইয়া বিশাল গদা হাতে ছুটিয়া আসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সেই গদার সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া শেষে ছুটিয়া পলাইল। তখন রাবণ আর অর্জুনের যে যুদ্ধ হইল, সে বড়ই ভয়ানক। দুজনেরই যেমন বিশাল দেহ, হাতে তেমনি ভীষণ গদা। ভয়ানক তেজের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শেষে অর্জুনের গদার ঘায়ে রাবণ অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। অর্জুনও অমনি তাহাকে ধরিয়া এমনি বাঁধন বাঁধিলেন যে সে কথা আর বলিবার নয়, তাহা দেখিয়া দেবতাগণের কী আনন্দই হইল; তাঁহারা যে যত পারিলেন, অর্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

এদিকে রাক্ষসেরা আসিয়া অর্জুনের হাত হইতে রাবণকে ছাড়াইয়া নিতে কত চেষ্টাই করিল, কিন্তু সে কি তাহাদের কাজ? অর্জুন তাহাদিগকে ঠেঙাইয়া রাবণকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

এখন রাবণের তো আর সঙ্কটের সীমাই নাই, এ সঙ্কট হইতে তাহাকে কে

বাঁচায় ? বাঁচাইবার লোক একটি মাত্র আছেন, তিনি হইতেছেন উহার পিতামহ পুলস্ত্য মুনি। মুনিঠাকুর নাতির মায়া এড়াইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অর্জুনকে বলিলেন, 'বাছা, আমার নাতিটিকে ছাড়িয়া দাও। উহাকে যে সাজা দিয়াছ তাহাতেই তোমার খুব নাম হইবে, আর উহাকে রাখিয়া লাভ কী ?'

এ কথায় অর্জুন খুশি হইয়া তখনই রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন, সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া চোরের মত সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু দুষ্টু লোকের লজ্জা আর কতকাল থাকে ? দুদিন পরেই দেখা গেল যে রাবণ আবার রাজাদিগকে খোঁচাইয়া ফিরিতেছে।

—